সন্ধিক্ষণ

পরিবেশক :

দে বুক স্টোর

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর | ১৯৬২

প্রকাশক ঃ
রেখা বিশ্বাস
'মাঙ্গলিক'
উত্তরায়ণ | মধ্যমগ্রাম
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
দীননাথ সেন।

মুদ্রক ঃ
পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা-৯।

কার্তিককে

সন্ধিক্ষণ

উত্তর কলকাতার এই প্রাচীন বাড়িটার — যার নাম 'দত্ত ম্যানসন'— বয়স দেড়শ' বছরেরও বেশি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এটা তৈরি হয়েছিল। কলকাতা মেট্রোপলিসের হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের তালিকায় 'দত্ত ম্যানসন'-এর নাম অবলীলায় ঢুকে যেতে পারে।

ছড়ানো কমপাউন্ডের মধ্যিখানে বিশাল তেতলা বাড়িটার আগাপাশতলা সেকেলে অর্কিটেকচারের ছাপ। পুরু পুরু ছত্রিশ ইঞ্চি দেওয়াল। সেগুন কাঠের চওড়া চওড়া, মজবুত দরজা। জানালায় দু'টো করে পাল্লা। সেগুলোর একটায় খড়খড়ি, অন্যটায় রঙিন কাচ বসানো। উঁচু উঁচু সিলিংয়ে পঙ্খের কাজ। বাড়িটার সামনে এবং পেছনের ফাঁকা জায়গায় একসময় খুব যত্ন করে বাগান করা হয়েছিল। দামি দামি, দুর্লভ গাছ কবেই হেজেমজে গেছে। নিজস্ব পরমায়ুর জোরে দু-চারটে সিলভার পাম এখনও আধমরা হয়ে টিকে আছে। আর রয়েছে কিছু আগাছা। ওগুলো আপনা থেকেই জন্মায়। এক দিকের কমপাউন্ড-ওয়ালের গায়ে গ্যারাজ। এককালে চারটে গাড়ি ছিল, এখন স্রেফ একটায় ঠেকেছে। গ্যারাজের পাশে কাজের লোকদের থাকার জন্য সারি সারি ঘর; সেগুলোর মাথায় অ্যাজবেস্টসের ছাউনি।

'দত্ত ম্যানসন'-এর মূল বিল্ডিংয়ের দেওয়ালগুলোর কোথাও প্লাস্টার খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। কার্নিসও অনেক জায়গায় ভাঙাচোরা। বাড়িটা ছিল গোলাপি। রোদে বৃষ্টিতে রং উঠে উঠে, কবেই ফিকে হয়ে, তার ওপর কালচে কালচে ছোপ পড়েছে। এই ইমারত বহুকাল মেরামত করা হয় নি।

ইংরেজ আমলে দত্তদের কয়েক পুরুষ চুটিয়ে ব্যবসা ট্যাবসা করে টাকার পাহাড় জমিয়েছিলেন। শুধুই অর্থের পেছনে উন্মাদের মতো তাঁরা ছুটেছিলেন, এটা ঠিক নয়। বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা ছিল ব্যাপক। রাজনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন, গানবাজনা, খেলাধুলো—সমস্ত বিষয়েই তাঁদের বিপুল আগ্রহ ছিল। এসবের মধ্যে ওঁরা নিবিড়ভাবে জড়িয়েও গিয়েছিলেন। এলিট সোসাইটির মানুষ বলতে যা বোঝায়, দত্তরা ছিলেন তাই। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সি আর দাশ, বিপিন পাল থেকে শুরু করে কত যে কীর্তিমান বাঙালি এ বাড়িতে এসেছেন! কিন্তু সেসব এখন শুধুই ইতিহাস। সুদূর কোনও স্বপ্নের মতো।

প্রথম দিকের পাঁচ ছ'পুরুষ যা করে গিয়েছিলেন সেই বোলবোলাও পরে আর ছিল না। স্বাধীনতার কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছে ভাঁটার টান। পরিবারিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে বংশধরদের লেশমাত্র আগ্রহ নেই। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অত বড় বিজনেস স্বাভাবিক নিয়মেই বন্ধ হয়ে গেছে। বংশের আদি পুরুষেরা দেশের নানা ব্যাপারে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শেষ দিকের তিন প্রজন্ম নিজেদের পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর নীতি আর আদর্শকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দেশের সীমানা পার করে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষমতাদখল নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কামড়া কামড়ি, ঘুষ, পারমিটরাজ আর কোরাপশনে আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সকল স্তরে শুধু ক্ষয়, শুধুই ক্যানসারের ঘা। প্রথম দিকের পাঁচ ছ' জেনারেশনের দত্তরা বেঁচে থাকলে কোনওভাবেই এসব মেনে নিতেন না, শিরদাঁড়া টান টান করে প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু পরের দিকের দত্তদের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। দেশ জাহান্নামে যায় তো যাবে, তাতে আমাদের কী? আমরা সব আঁচ থেকে গা বাঁচিয়ে দিন কাটিয়ে দেব। এই জাতীয় জীবন দর্শনে তাঁরা বিশ্বাসী। তবে এটা বলতেই হবে, এঁরা কেউ উড়নচন্ডে নন। মদে মেয়েমানুষে রেসে জুয়ায় পূর্বপুরুষের জমানো টাকা উড়িয়ে ঝুড়িয়ে দেন নি।

পড়াশুনোর ব্যাপারটা শুরু থেকেই প্রতি প্রজন্মের বাপ-ঠাকুরদারা তাঁদের পরের জেনারেশনের হাড়ে মজ্জায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। সেটা কেউ অমান্য করেননি। প্রথম দিকের দত্তরা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে নিজেদের ব্যবসাতে বসতেন। শেষের তিন জেনারেশন বড় বড় কোম্পানিতে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছেন। মাসের শেষে মোটা পে-প্যাকেট, পার্কস। নির্ঝঞ্ঝাট, উদ্যমহীন জীবন। এদের আজকের দিনটা কালকের মতো, কালকের দিনটা পরশুর মতো। একটি দিন আরেকটা দিনের হুবহু ফোটো কপি। বাইরের সমস্ত কিছু থেকে নিজেদের সরিয়ে এনে দত্তরা এখন কুয়োর ব্যাঙ।

আপাতত 'দত্ত ম্যানসন'-এর বাসিন্দা সবসুদ্ধ ছ'জন। সুজাতা. তার শ্বশুর নিশানাথ, শাশুড়ি স্বর্ণলতা, খুড়শাশুড়ি বিনোদিনী. ছোট ননদ দেবযানী যার ডাকনাম সোনা এবং দেওর অমিত। অমিতেরও একটা ডাকনাম আছে — বাবুন। সুজাতার আরও একটি ননদ আছে — জয়ন্তী। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে থাকে সাউথ ক্যালকাটায়, লেক মার্কেটের কাছে।

সুজাতাকে দিয়ে শুরু করা যাক। সে এ বাড়ির পুত্রবধূ। বছর চারেক আগে তার স্বামী অঞ্জন হিমালয়ে ট্রেকিং করতে গিয়ে মারা যায়।

সুজাতার বয়স এখন উনত্রিশ। অঞ্জনের যখন মৃত্যু হয় তখন সে সবে পঁচিশে পা দিয়েছে। স্বামী নেই, 'দত্ত ম্যানসন'-এর সঙ্গে তার সম্পর্কের সুতোটা লহমায় আলগা হয়ে গিয়েছিল। অনেক আগেই সে এখান থেকে চলে যেতে পারত, কিন্তু যাওয়া হয় নি। কেন হয় নি, সে কথা পরে।

সুজাতা আর অঞ্জনের বেডরুমটা তেতলার দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায়। সেটার লাগোয়া বাথরুম। চার বছর সে এখানে একাই থাকছে।

সাড়ে আটটাও বাজে নি। এরই ভেতর স্নানটান সেরে এইমাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সুজাতা। সোয়া ন'টায় অফিস থেকে গাড়ি আসবে। সে একটা বিদেশি ব্যাঙ্কের অফিসার। ক্যামাক স্ট্রিটে তার অফিস। রোজই ব্রেকফাস্ট করে সে বেরিয়ে পড়ে। দুপুরে খাওয়ার জন্য বাড়ি আসে না। অফিস থেকে লাঞ্চ দেওয়া হয়। তার ফিরতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যায়।

বেডরুমটা বিশাল। পঁচিশ ফিট বাই বিশ ফিট। শ্বেত পাথরের মেঝে। কার্পেট, এয়ারকুলার, মেহগনি কাঠের ভারী ভারী আসবাব ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। অফিস থেকে সুজাতাকে দু'টো ফোন দেওয়া হয়েছে। একটা ল্যান্ড লাইনের, একটা মোবাইল। ল্যান্ড লাইনেরটা খাটের পাশে একটা ছোট নিচু টেবলে রাখা আছে।

কাল বিকেলে রজতাভ অফিসে ফোন করে জানিয়েছিল, আজ দুপুরে সুজাতা আর সে একসঙ্গে লাঞ্চ খাবে। পার্ক স্ট্রিটে একটা দামি রেস্তোরাঁয় টেবল রিজার্ভও করে রেখেছে।

এর আগে রজতাভর সঙ্গে সে যে কোনও রেস্তোরাঁয় যায় নি তা নয়, অনেক বারই গেছে। চা কফি প্যাটিস কাটলেট বা অন্য কিছু খেয়ে, খানিকটা সময় একসঙ্গে কাটিয়ে, গল্প টল্প করে চলে এসেছে। কিন্তু তাকে লাঞ্চে ডাকাটা এই প্রথম।

একটু অবাকই হয়েছিল সুজাতা। 'হঠাৎ আমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে চাইছ!'

রজতাভ বলেছিল, 'ইচ্ছে হল। মিনিমাম ঘন্টা দুয়েক সময় হাতে নিয়ে আসবে। এসেই গোগ্রাসে খেয়ে পালাবে, সেটি কিন্তু হবে না।'

সুজাতা আঁতকে উঠেছে। বিদেশি ব্যাঙ্ক যেমন অজস্র টাকা দেয়, খাটিয়ে খাটিয়ে হাড়মাংস তেমনি ছিবড়ে করে ছাড়ে। কাজের চাপ এত বেশি যে নিশ্বাস ফেলার ফুরসত মেলে না। নিজের চেম্বারে বসেই ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে, কিংবা

কম্পিউটারে চোখ রেখে তাকে পনেরো মিনিটের ভেতর লাঞ্চ সেরে নিতে হয়। দুপুরে বাইরে গিয়ে খাওয়ার জন্য দু'ঘন্টা কাটিয়ে আসা অসম্ভব। কাজের ওজর তুলে লাঞ্চটা এড়াতে চেয়েছিল সে, কিন্তু রাজতাভ কোনও কথা শোনে নি। বলেছে, 'তোমাকে আসতেই হবে। ভীষণ জরুরি কথা আছে।'

রজতাভর কণ্ঠস্বরে এমন এক জোর এবং আবেগ ছিল যে না বলতে পারে নি সুজাতা। অগত্যা ম্যানেজারকে বলে আজ দুপুরের পর হাফ-ডে ছুটি নিয়ে রেখেছে। রজতাভ দু' ঘন্টা সময় চেয়েছিল, কিন্তু ও যা ছেলে, লাঞ্চটাকে হয়তো তিন ঘন্টায় টেনে নিয়ে যাবে। তারপর আর অফিসে ফিরে যাবার মানে হয় না।

রজতাভের সঙ্গে দু-আড়াই বছরের আলাপ। এর মধ্যে কত কথাই তো হয়েছে, কত গল্প। কিন্তু কাল ফোনটা পাওয়ার পর থেকে বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠেছিল। রজতাভ কী বলবে, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে সুজাতা। গত কয়েক মাস ধরেই হঠাৎ হঠাৎ গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকায়, ওর আচরণে এবং আলটপকা দু-একটা কথায় রজতাভ এমন ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিল যা না বোঝার কারণ নেই। খুব সম্ভব, লাঞ্চ খেতে খেতে আজ সেটাই সে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবে।

কাল অফিস থেকে অন্যমনস্কর মতো বাড়ি ফিরে এসেছিল সুজাতা। রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি। বিচিত্র এক উত্তেজনা তার স্নায়ুমণ্ডলীতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই সঙ্গে আশ্চর্য এক সুখ আর ভীরুতা, এবং খানিকটা দ্বিধাও। সব মিলিয়ে পাঁচমেশালি অনুভূতি। ঘুম ভাঙার পর থেকে সেটা তীব্র হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

বেডরুমে এসে সোজা ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে পড়েছিল সুজাতা। আয়নায় যে তরুণীর প্রতিবিম্ব পড়েছে তার বয়স উনত্রিশ হলেও সেটা যেন পাঁচিশে থেমে আছে। ভরাট, লম্বা ধরনের মুখ—অনেকটা ডিম্বাকৃতি। ভুরু দু'টোতে নিখুঁত তুলির টান। ঘন পালকে ঘেরা, টানা টানা দুই চোখের কালো মণি দু'টো এমনই স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল, মনে হয়, আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে। ছোট কপাল। সরু চিবুক। পাতলা, ফুরফুরে নাক। হাত-পা-আঙুল এবং গলা, সমস্ত কিছু নিটোল। শরীরে অনাবশ্যক মেদ একটুও নেই। মসৃণ ত্বক। রংটা টকটকে ফর্সা নয়, সামান্য চাপা ধরনের। ঝলমলে স্বাস্থ্যের অধিকারিণী সুজাতাকে ঘিরে আছে এক মায়াবী দ্যুতি, সেটা তার আকর্ষণ শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তার তাকানো, হাসি, ধীর স্বরে কথা বলার ভঙ্গি— সমস্ত কিছুর মধ্যে

রয়েছে অদৃশ্য চুম্বক। যে কোনও পুরুষ তার দিকে তাকালে মুগ্ধ হয়ে যাবে। উনত্রিশে শরীরে যখন চোরাবানের মতো শিথিলতা ঢুকতে শুরু করে তখনও সুজাতা পূর্ণযুবতী। চব্বিশে তার বিয়ে হয়েছিল। এক বছর বাদে অঞ্জনের মৃতদেহ যখন 'দত্ত ম্যানসন'-এ এসে পৌঁছল, সব শেষ। বিবাহিত জীবনের কোনও ছাপই তার ওপর পড়ে নি।

আয়নায় কয়েক পলক নিজেকে দেখল সুজাতা। এমনিতে চড়া রঙে মুখটুখ পেইন্ট করা, উগ্র সাজপোশাক আদৌ পছন্দ করে না সে। যে ধরনের ঝকঝকে অফিসে তার চাকরি, যে সব ক্লায়েন্টকে নিয়ে তাকে ডিল করতে হয়, সেখানে প্যান্ট-শার্টটাই বেশি মানানসই। প্যান্টশার্ট সে বেশির ভাগ দিনই পরে। নইলে হালকা রঙের সালোয়ার কামিজ, ক্বচিৎ কখনও শাড়ি।

আজ রজতাভ তাকে ভীষণ জরুরি কিছু বলবে। অনেকদিন বাদে একটু বেশি করে সাজতে ইচ্ছা করল সুজাতার। পরক্ষণে ভেতর থেকে কেউ যেন ধমকে ওঠে। সে এখনও 'দত্ত ম্যানসন'-এর পুত্রবধূ। বিধবা। এবাড়ির বাসিন্দাদের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়, এমন সাজসজ্জা করাটা ঠিক নয়। শোভনতা বলে শব্দটা মুহূর্তের জন্যও সে ভোলে না।

আজ মাথায় শ্যাম্পু করে ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিয়েছিল সুজাতা। কাঁধ অব্দি ছাঁটা চুলগুলো মিহি রেশমের সুতোর মতো উড়ছে। তবে গলায় কপালে গালে পোখরাজের দানার মতো ফোঁটা ফোঁটা জল লেগে আছে। ড্রেসিং টেবলের এক ধারে তোয়ালেটা রাখা ছিল। অফিসে বেরুবার সময় হয়ে এল। আর বসে থাকলে চলবে না। ত্বরিত হাতে তোয়ালে তুলে নিয়ে কপাল টপালের জলকণাগুলো মুছে নিল সে। তারপর আই-লাইনার দিয়ে চোখের নিচে নিপুণ রেখা টানল। ঠোঁটে এবং মুখে লাগাল লালচে রং। মুখে আলতো করে লাগাল পাউডারের প্রলেপ। ব্রাশ করে চুলগুলো পেছন দিকে সরিয়ে দিল। দুই ভুরুর মাঝখানে আঁকল ছোট্ট একটি টিপ।

সুজাতার পরনে এই মুহূর্তে হালকা কিমোনো ধরনের পোশাক। আগে থেকেই সে ভেবে রেখেছে, আজ শাড়ি পরে যাবে। শাড়িটা পরার পর সারা শরীরে মৃদু সেন্ট ছড়িয়ে দেবে। ফরাসি কোম্পানির এই পারফিউম ঝাঁঝাল নয়, মিষ্টি সৌরভে সারাক্ষণ চারপাশ ভরিয়ে রাখে।

আয়নার এখন যাকে দেখা যাচ্ছে, সে অলৌকিক কোনও পরি। নিজেকেই যেন চিনতে পারছে না সুজাতা। তার মধ্যে এখনও যে এমন একটা ম্যাজিক রয়েছে, কতদিন সে তা লক্ষ করে নি! রজতাভই হঠাৎ করে সেই ইন্দ্রজালটাকে

বার করে এনেছে। আশ্চর্য এক ভালো লাগায় মন ভরে গেল তার। মনে হল, কে যেন কাছাকাছি কোথাও নরম হাতে এস্রাজে ছড় টানছে। সুরটা ধীরে ধীরে তার মধ্যে চরিয়ে যাচ্ছে।

একসময় উঠে পড়ে সুজাতা। ডানপাশের দেওয়াল ঘেঁষে তার ওয়ার্ডরোব। ওটা থেকে শাড়ি বার করতে হবে। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ বাঁ ধারের দেওয়ালের দিকে নজর চলে গেল। সেখানে সোনালি ফ্রেমে অঞ্জনের ফুল সাইজ ছবি আটকানো রয়েছে। স্পোর্টসম্যান অঞ্জন ছিল দারুণ সুপুরুষ। তার হাস্যোজ্জ্বল মুখটি এমনই জীবন্ত, যেন ছবির ফ্রেম ভেঙে এক্ষুনি সে বেরিয়ে আসবে। ছবির গায়েই একটা কাচের শো-কেসে অজস্র কাপ, মেডেল এবং নানা ধরনের ট্রোফি। সারা ভারতের কত যে কম্পিটিশনে ও নাম দিত! চ্যাম্পিয়ন না হয়ে কখনও ফেরে নি। কাপমেডেলগুলো তারই স্মৃতিচিহ্ন।

বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল সুজাতার। খানিক আগে যে বাজনাটা শোনা যাচ্ছিল সেটা থেমে গেছে। কেমন অস্থির অস্থির লাগছে তার।

কয়েক লহমা অঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থাকে সুজাতা। তারপর দ্বিধান্বিতের মতো ওয়ার্ডরোবের দিকে এগিয়ে যায়। কোনও দিনই অঞ্জন ফিরে আসবে না। সে শুধুই স্মৃতি। শুধুই পিছুটান। কিন্তু রজতাভ? সে টানছে সামনের দিকে। প্রবল, অপ্রতিরোধ্য কোনও শক্তিতে।

আনমনা সুজাতা ওয়ার্ডরোব খুলে ফেলে। শাড়ি ট্রাউজার্স শার্ট সালোয়ার কামিজ — সব থাকে থাকে সাজানো।

অনেক বাছাবাছির পর একটা মাইশোর সিল্ক বার করল সুজাতা। শাড়িটার জমি হালকা সোনালি রঙের, তার ওপর ছোট ছোট ময়ূরের প্রিন্ট। ওটার সঙ্গে যাতে ম্যাচ করে, তাই ব্লাউজের পাহাড় ঘাঁটতে থাকে সে। কিন্তু পছন্দ মতো ব্লাউজ বার করার আগেই ঘরে এসে ঢোকে শ্যামা। ষোলো-সতেরো বছর বয়স, কালো, রোগা, দাঁত-উঁচু। পুরু ঠোঁট। সেখানে যত খুঁতই থাক, চোখদু'টো ভারি সুন্দর। অপার মায়ায় ভরা। তা ছাড়া, ওর চেহারায় রয়েছে আশ্চর্য এক সারল্য। ওকে দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। ওদের বাড়ি ক্যানিং লাইনের শেষ মাথায়। বছর তিনেক সে 'দত্ত ম্যানসন'-এ কাজ করছে।

শ্যামার হাতে একটা মস্ত ট্রে। তাতে ছোট বড় প্লেটে রয়েছে লুচি, বেগুনভাজা, আলুর তরকারি, নানা ধরনের টুকরো টুকরো ফল, একটা বড় সন্দেশ। তার সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম।

রোজ এই সময়টা সকালের খাবার নিয়ে আসে শ্যামা। প্রতিদিনই যে লুচি তরকারি টরকারি, তা নয়। একেক দিন একেক রকম। কোনও দিন দুধ-কর্নফ্লেকস, কোনও দিন মাখন-লাগানো টোস্ট আর ওমলেট। নিজের ঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট সেরে নেয় সুজাতা।

বেডরুমের একধারে বেতের নিচু সোফা আর সেন্টার টেবল রয়েছে। টেবলে ট্রেটা নামিয়ে রাখতে রাখতে শ্যামা ডাকল, 'বৌদিদি—'

শ্যামা যে এসেছে, পায়ের শব্দেই টের পেয়েছিল সুজাতা। এদিকে মনের মতো ব্লাউজ পেয়ে গেছে সে। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা বন্ধ করে, শাড়ি আর ব্লাউজ নিয়ে, ঘরের একধারে কাঠের নিচু পার্টিশন দিয়ে ঘেরা জায়গায় যেতে যেতে বলল, 'তুই একটু ব'স—'

যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হচ্ছে, শ্যামা বললেও বসবে, না বললেও বসে থাকবে। সে মেঝেতে কার্পেটের ওপর থেবড়ে বসে পড়ল।

পাঁচ সাত মিনিটের ভেতর পোশাক বদলে সোফায় গিয়ে বসল সুজাতা। ওয়াল ক্লকে ন'টা বাজতে পাঁচ। ক্ষিপ্র হাতে লুচির টুকরো ছিঁড়ে খেতে শুরু করল।

শ্যামা তার দিকে তাকিয়ে ছিল। পলকহীন। দু'চোখে অনন্ত বিস্ময় এবং মুগ্ধতা। খেতে খেতে হঠাৎ সুজাতার নজর গিয়ে পড়ল মেয়েটার ওপর। ভুরু সামান্য তুলে জিগ্যেস করল, 'অমন বড় বড় চোখ করে কী দেখছিস?'

শ্যামা বলল, 'তোমায়। রোজ কোট প্যান্টুল পরে মেমসায়েব সেইজে আপিসে যাও। আমার ভালো লাগে না। আজ বেনারসি শাড়ি আর বেলাউজে কী সোন্দর যে নাগচে! ঠিক ঝ্যানো — ঠিক ঝ্যানো —' জুতসই একটা উপমা সে হাতড়াতে লাগল।

শ্যামা বেনারসি আর মাইশোরের তফাত বোঝে না। না বুঝুক. আজ এমন একখানা চমৎকার শাড়ি পরার কারণ যে কী, সেটা তো আর তাকে বলা যায় না। মুখচোখের ভাব দেখে পাছে মেয়েটার খটকা না লাগে, তাই নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে হবে। ভেতরকার লেশমাত্র চাঞ্চল্য কোনও ভাবেই বেরিয়ে আসতে দেওয়া চলবে না। লঘু সুরে সুজাতা জানতে চাইল, 'ঠিক যেন কী?'

এতক্ষণে উপমাটা ভেবে বার করে ফেলেছে শ্যামা, 'ওই ঝে গ, সেনেমা করে, ঐশয্য রায়, রানী মুকাজ্জি, ঠিক সেই রকম। পরি গো, পরি —' তিন বছর কলকাতায় কাটিয়ে দিলেও তার কথাবার্তায় এখনও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গেঁয়ো টান।

খানিক আগে ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে পরির কথা সুজাতাও ভেবেছিল। আশ্চর্য, লেখাপড়া না-জানা গেঁয়ো মেয়েটার মাথাতেও সেই একই উপমা এসেছে।

'খুব ...ছিস। দিনরাত টিভিতে সিনেমা দেখে দেখে মাথায় সারাক্ষণ হিরো হিরোইনরা গিজ গিজ করে। পাজি কোথাকার!' চোখ পাকিয়ে ধমকে ওঠে সুজাতা। কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা আশকারা রয়েছে।

চোখ গোল করে শ্যামা বলে, 'কোতায় দিনরাত সেনেমা দেকি! আমার বলে কত কাজ! সব্বক্ষণ চরকির মতো ঘুরতিচি। সোমায় (সময়) পেলে মাজে মদ্যে (মাঝে মধ্যে) টিভি'র সামনে গে বসি।'

সুজাতা উত্তর দিল না।

শ্যামা এবার বলে, 'তোমার এট্টা কতা কইব বৌদিদি?'

সুজাতা জিগ্যেস করে, 'কী কথা?'

'একন থিকে রোজ তুমি শাড়ি পরে আপিস যেও—'

মজার গলায় সুজাতা বলল, 'ঠিক আছে, তোমার হুকুম আমার মনে থাকবে মহারানী।'

দুই

খাওয়া হয়ে গেলে এঁটো প্লেট কাপটাপ নিয়ে চলে গেল শ্যামা। সকালে মুখটুখ ধোওয়ার পর অফিসের জরুরি কাগজপত্র আর ফাইল টাইল একটা ব্যাগে গুছিয়ে রাখে সুজাতা। সেটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

তার বেডরুমের পাশ দিয়ে চওড়া, টানা শ্বেত পাথরের বারান্দা চলে গেছে। সেটার একধারে লোহার রেলিং। আরেক ধারে লাইন দিয়ে ঘরের পর ঘর। সবগুলো একই মাপের। তবে বেশির ভাগ ফাঁকা। এত বড় বাড়ির তুলনায় এখানে মানুষ অনেক কম।

সুজাতার বেডরুমের দু'টো ঘর পর খুড়শাশুড়ি বিনোদিনীর ঘর। অত বড় কামরাটার আধাআধি জুড়ে, এক দেওয়াল থেকে আরেক দেওয়াল অব্দি, রুপোর প্যানেল-করা সিংহাসনে শ'খানেক দেবদেবীর ফোটো বা মূর্তি। মূর্তিগুলোর কোনওটা কালো পাথরের, কোনওটা তামার, কোনওটা কাঠের বা রুপোর, কোনওটা বা অষ্টধাতুর। ঘরের আরেক দিকে খাট, আলমারি, দেওয়াল

আয়না, আলনা এবং এককোণে গ্যাসে রান্নার ব্যবস্থা। 'দত্ত ম্যানসন'-এ রাঁধুনি বামুন আছে। কিন্তু বিনোদিনী পারিবারিক হেঁশেলের ভাত-তরকারি মুখে তোলেন না। নিজের রান্না নিজেই করে নেন।

বিনোদিনীর ছেলেমেয়ে হয় নি। স্বামীর মৃত্যুর পর পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, উদাসীন। সারাদিন ঠাকুর দেবতা নিয়ে আছেন। ক্বচিৎ কখনও ঘর থেকে বাইরে বেরোন। ওই ঘরটাই তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

টানা বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল, বিনোদিনী তাঁর ঘরে দেবদেবীর সিংহাসনের সামনে বসে আছেন। এর মধ্যেই স্নান হয়ে গেছে। পরনে ধবধবে সাদা থান। কাঁচাপাকা ভেজা চুল পিঠময় ছড়ানো। কোনাকুনি বসে থাকার কারণে মুখটা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। ডান পাশের গাল নাক ঠোঁট কপাল এবং ভুরুর একটা অংশ চোখে পড়ছে। টকটকে রং। ষাটের কাছাকাছি বয়স। কিন্তু এখনও টের পাওয়া যায়, একসময় আশ্চর্য রূপসী ছিলেন মহিলা।

বিনোদিনীর ঠিক পাশেই একটা বিরাট বেতের সাজি বোঝাই প্রচুর ফুল, মালা এবং তামার টাটে ঘষা চন্দন। তিনি নিশ্চল বসে নেই। ফুলটুল দিয়ে দেবদেবীর মূর্তিগুলো সাজাচ্ছেন।

সুজাতা জানে, ওই সাজসজ্জার কাজ শেষ হতে হতে ঘন্টা দেড় দুই পেরিয়ে যাবে। তারপর ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নিষ্ঠাভবে পুজো সারতে সারতে বেলা কাবার। তারপব রান্না, খাওয়া। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে ফের পুজোর তোড়জোড়। শীত-গ্রীষ্ম, বারো মাস, এভাবেই তাঁর দিন কেটে চলেছে।

সুজাতা এগিয়ে যায়। বিনোদিনীর ঘর পেরুলে পর পর দু'টো ঘর ফাঁকা। তার পরেরটা দেবযানী অর্থাৎ সোনার বেডরুম। অঞ্জনের ছোট বোন এই মেয়েটি সুজাতার খুবই প্রিয়। এখনও কুড়ি পেরোয় নি। ঝকঝকে, সপ্রতিভ। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ। লেখাপড়ায় দুর্দান্ত। ইংরেজি অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে। সামনেই পার্ট ওয়ান পরীক্ষা।

জানালার পাশে সোনার পড়ার টেবল। সেখানে বসে কিছু লিখছিল সে। হঠাৎ মুখ তুলতেই খোলা দরজা দিয়ে সুজাতাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভুরু দু'টো অনেকটা ওপরে উঠে গেল। কয়েক পলক অবাক তাকিয়ে থাকে সে। তারপর প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'দারুণ মেক-আপ নিয়েছ তো! কী এলিগেন্ট যে তোমাকে লাগছে বৌদি!'

সুজাতা লজ্জা পেয়ে গেল। সাজগোজে কি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে? আর শ্যামার মতো সোনার চোখেও সেটা পড়েছে! বিব্রতভাবে বলল, 'কিসের মেক-আপ! একটা ভালো শাড়ি পরেছি—এই তো।'

'পার্টি টার্টি আছে নাকি?'

যাক, কোন বিশেষ কারণে আজ সে একটু বেশি সেজেছে তা আঁচ করতে পারে নি সোনা। পারলে সঙ্কোচে মাথা কাটা যেত। সুজাতাদের ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্টদের মধ্যে রয়েছেন বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস ম্যাগনেট। তাঁরা প্রায়ই ফাইভ-স্টার হোটেলে পার্টিটার্টি দেন। ব্যাঙ্কের টপ একজিকিউটিভদের তাঁরা আমন্ত্রণও জানান। পারতপক্ষে হোটেল টোটেলে যেতে চায় না সে। তবে ব্যাঙ্কের স্বার্থে দু-একবার না গেলেও নয়।

অজুহাত হিসেবে পার্টিটার্টি খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরল সুজাতা। বলল, 'হ্যাঁ, আছে।' বলেই পরক্ষণে খেয়াল হল, পার্টিগুলো হয় রাতের দিকে, কিন্তু রজতাভর সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে, তার জরুরি কথা শুনে, বাড়ি ফিরে আসতে কতক্ষণ আর লাগবে? বড় জোর বিকেল। সোনা যদি জিগ্যেস করে, আজকাল কি দুপুরে পার্টি হচ্ছে? সুজাতা চকিতে ভেবে নিল, তখন বানিয়ে টানিয়ে চোখকান বুজে যা হোক কিছু একটা বলে দেবে। সে আর দাঁড়াল না।

সোনার ঘর থেকে কয়েক পা এগুলেই ডান পাশে নিচে নামার সিঁড়ি। সুজাতা দোতলায় নেমে আসে।

তেতলার মতো দোতলা এবং একতলাতেও একই ধাঁচের সারি সারি ঘর, বারান্দা। দোতলায় সোনার ঠিক নিচের ঘরটা অমিত অর্থাৎ বাবুনের। আর শেষ মাথায় তাঁর আর অঞ্জনের বেডরুমের তলায় তার শ্বশুর-শাশুড়ি নিশানাথ এবং স্বর্ণলতার বেডরুম। একতলায় কিচেন, স্টোর, ডাইনিং হল এবং বিশাল ড্রইংরুম। গেস্টটেস্ট কেউ এলে তাদের জন্য একটা আলাদা ঘরও আছে।

রোজ অফিসে বেরুবার আগে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করে যায় সুজাতা। কাজেই এখন তাকে ডান দিকে ঘুরতে হবে। বাবুনের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখ পড়ল, সে খাটের ওপর থম মেরে বসে আছে। চোখে অস্বাভাবিক, ঘোলাটে দৃষ্টি। এই লক্ষণটা চেনে সুজাতা। তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

অমিতের বয়স চব্বিশের কাছাকাছি। বিয়ের পর এ-বাড়িতে এসে সুজাতা শুনেছে অমিত ছিল প্রাণবন্ত একটি ছেলে। সারাক্ষণ তার হইচই, সারাক্ষণ

মজা। এনার্জিতে টগবগ করত। মাতিয়ে রাখত চারদিক। ছাত্রও ছিল বেশ ভালো। কিন্তু তার বয়স যখন উনিশ, রাস্তা পেরুতে গিয়ে জিপের ধাক্কায় মাথায় বড় রকমের চোট পেয়েছিল। তারপর পাগল হয়ে যায়। বদ্ধ উন্মাদ। চিকিৎসার কোনও রকম ত্রুটি হয় নি। কলকাতায় তো বটেই, দিল্লি মুম্বাই চেন্নাই —কোথায় না তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে! টাকা খরচ হয়েছিল জলের মতো। ফল যে কিছুটা হয় নি তা নয়। এখন বছরের কয়েকটা মাস মোটামুটি সুস্থ, স্বাভাবিক থাকে সে। তারপর আবার পাগলামি শুরু হয়ে যায়। এই সময়টা মারাত্মক ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে। তখন তাকে পাগলা গারদে পাঠাতে হয়।

অমিতের মধ্যে যে পাগলামি ফিরে আসছে, সেটা কিন্তু আগে থেকেই টের পাওয়া যায়। পুরোপুরি উন্মাদ হবার কিছুদিন আগে সে একেবারে চুপ হয়ে যায়। পালটে যেতে থাকে তার চোখের দৃষ্টি। সারা বছর ভাগাভাগি করে কয়েক মাস সে কাটায় বাড়িতে, কয়েক মাস লুনাটিক অ্যাসাইলামে।

আজ অমিতের চেহারায় যে-লক্ষণটা প্রকট হয়ে উঠেছে তাতে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল সুজাতার। একটু দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অমিত তার দিকে অদ্ভুত চোখে একবার তাকাল ঠিকই, কিন্তু একটি কথাও বলল না। বুঝিবা চিনতেই পারল না। অন্য দিন অফিস যাবার সময় এখানে এলে অমিত হেসে হেসে একটু গল্প টল্পও করে। কিন্তু আজ একেবারে বোবা।

এখন দাঁড়াবার সময় নেই। লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্তে শ্বশুর-শাশুড়ির ঘরে চলে এল সুজাতা। অন্য সব বেডরুমের মতো এটাও সেকেলে আসবাবে সাজানো। তবে এখানে একটা বাড়তি খাট আছে।

এক খাটে নির্জীব পড়ে আছেন তার শ্বশুর নিশানাথ। বছর তিনেক আগে একটা ম্যাসিভ স্ট্রোকের পর প্রায় সর্বক্ষণ এভাবেই পড়ে থাকেন তিনি। শীর্ণ, হাড়সার চেহারা, গাল ভাঙা, চোখ বসে গেছে। গায়ের চামড়া কুঁচকে মুচকে ঢলঢলে। মনে হয়, একটা খোলস পরে আছেন। পরিচর্যা করার জন্য তাঁর নিজস্ব একটি লোক আছে। সে-ই তাঁকে খাওয়ায়, বাথরুমে নিয়ে যায়। সারা দিন শুয়ে থেকে যাতে শরীরের কলকবজা পুরোপুরি বিকল না হয়ে যায় তাই ঘরের মধ্যে এবং বাইরের বারান্দায় ধরে ধরে কিছুক্ষণ হাঁটায়।

নিশানাথ শুয়ে থাকবেন, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু যা সুজাতাকে অবাক করল সেটা হল, নিশানাথের খাটের পাশের খাটটায় স্বর্ণলতাও চুপচাপ শুয়ে আছেন। এমনটা আগে কখনও দেখে নি সে।

সকাল হলেই রান্নার ঠাকুর এবং অন্য সব কাজের লোকদের এই ঘরে ডেকে কে কী করবে, সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। শুধু তা-ই নয়, ডিউটিগুলো ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কিনা, সে জন্য ঘরে বসেই ধমক ধামক, চেচাঁমেচি চলে। মাঝে মাঝে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দেখে আসেন, সব ঠিকঠাক চলছে কিনা। যদি কারুর গাফিলতি চোখে পড়ে তার রেহাই নেই। ভালো মাইনে দেন তিনি, কিন্তু ফাঁকিবাজি আদৌ বরদাস্ত করেন না। কেউ সেটি করলে হয় মাইনে কাটবেন, নইলে তক্ষুনি দূর করে দেবেন।

স্বর্ণলতা এ বাড়ির হাই-কমান্ড। বিপুল প্রতাপে তিনি 'দত্ত ম্যানসন' শাসন করে চলেছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

তাঁর বয়স এখন বাষট্টি কিন্তু তাঁর চেয়ে ছোট বিনোদিনীর মতো বুড়িয়ে যান নি। মাথার চুল বেশির ভাগটাই কাঁচা। তবে শরীর ভারী হয়ে গেছে। চোখেমুখে কথাবার্তায় রয়েছে প্রখর ব্যক্তিত্বের ছাপ।

সুজাতা সকাল থেকে রজতাভর ব্যাপারটা নিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। আজ যে স্বর্ণলতার হাঁকডাক কানে আসে নি, সেটা লক্ষ করে নি সে।

শাশুড়ির খাটের কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে সুজাতা। তার রীতিমতো উৎকণ্ঠা হচ্ছিল।

স্বর্ণলতার চোখ দু'টো বোজা। সুজাতা একবার ভাবল ঘুম ভাঙাবে না। কিন্তু এমন একজন দাপুটে মহিলা কেন বেলা ন'টা সোয়া ন'টায় নিঝুম হয়ে শুয়ে আছেন সেটা না জানা অব্দি তার স্বস্তি হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত খুব আস্তে সে ডাকল, 'মা—'

এক ডাকেই চোখ মেললেন স্বর্ণলতা। ভেতরে ভেতরে তাঁর যে একটা কষ্ট হচ্ছে, বাইরে তা ফুটে বেরিয়েছে। সুজাতা জিগ্যেস করল, 'আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ। কাল রাত থেকে পেটের সেই ব্যথাটা হচ্ছে।'

হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন স্বর্ণলতা, সুজাতা উঠতে দিল না। বলল, 'না না, আপনি শুয়ে থাকুন।'

স্বর্ণলতা শুয়েই থাকলেন। মাস ছয়েক ধরে মাঝে মাঝে, তাঁর পেটে একটা ব্যথা হচ্ছে। প্রথম দিকে গা করেন নি। বদহজম বা গ্যাস, এই বলেই উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বাড়ির ডাক্তারকে অবশ্য ডাকা হয়েছে। তাঁরও সেই রকমই ধারণা। ঠেসে হজম আর অম্বলের ওষুধ দিয়েছেন। সাময়িক কষ্টটা চাপা পড়ে, কিন্তু ফের চাড়া দিয়ে ওঠে। সুজাতা অনেকবার বলেছে, ব্যাপারটা অবহেলা করা

ঠিক নয়। রক্ত থেকে শুরু করে সব কিছু 'চেক' করে নেওয়া দরকার। পরে ডাক্তারও একই কথা বলেছেন। স্বর্ণলতা জানিয়েছেন, সামান্য কারণে অত উতলা হওয়া ঠিক নয়। তেমন বুঝলে দেখা যাবে।

সুজাতা জিগ্যেস করল, 'ব্যথাটা কি খুব বেশি হচ্ছে?'

স্বর্ণলতার প্রচন্ড সহ্যশক্তি। কিন্তু আজ বোধ হয় যন্ত্রণাটা সামলাতে পারছেন না। বললেন, 'হ্যাঁ—'

সুজাতা বলল, 'আমি ডাক্তারবাবুকে ফোন করছি—'

'না না, অফিসের দেরি হয়ে যাবে। তুমি বেরিয়ে পড়। আমি কুঞ্জকে দিয়ে ডাক্তারকে খবর দেব।'

স্বর্ণলতার যা মেজাজ, তাঁর কথামতো না চললে, রেগে যাবেন। এই অবস্থায় তিনি উত্তেজিত হ'ন, সেটা ঠিক হবে না। দ্বিধান্বিতের মতো পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সুজাতা। হঠাৎ তার খেয়াল হয়, শরীর খারাপ হওয়ায় তার যে বাড়তি সাজগোজ হয়েছে সেটা স্বর্ণলতার নজরে পড়ে নি। নইলে শ্যামা আর সোনার মতো ঠিকই লক্ষ করতেন। মুখে হয়তো কিছু বলতেন না, তবে অবাক হতেন খুবই।

আরও একটা কথা আচমকা মনে পড়ে গেল সুজাতার। বাবুনের ফের পাগলামির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেটা কি স্বর্ণলতা জেনে গেছেন? খুব সম্ভব—না। এখন শরীরের যা হাল তাতে জানানো ঠিক হবে না। অবশ্য খবরটা ঠিকই তিনি পেয়ে যাবেন। বাড়ির কেউ না কেউ তাঁকে জানিয়ে দেবে।

বারন্দায় চলে গিয়েছিল সুজাতা। স্বর্ণলতা ডাকলেন, 'একটু শুনে যাও—'

সুজাতা ফিরে আসে। স্বর্ণলতা বললেন, 'আজ অফিস থেকে ফিরতে কি দেরি হবে?'

'না। সন্ধের আগেই চলে আসতে পারব।' সুজাতা বলল, 'কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'সেটা তখনই জানতে পারবে।'

স্বর্ণলতার প্রয়োজনটা কী, বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করতে সাহস হল না। 'আচ্ছা—' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুজাতা। এখন আর তার দাঁড়াবার সময় নেই।

তিন

অফিসের গাড়ি অন্য দিনের মতো 'দত্ত ম্যানসন'-এর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সোফার ছেলেটি বাঙালি। নাম বিকাশ। বেশ অল্পবয়সী। বাইশ তেইশের বেশি হবে না। দারুণ চটপটে। শতকরা নব্বই ভাগ বাঙালি সময়ের ব্যাপারে ভীষণ ঢিলেঢালা। দশটায় আসবে বললে সাড়ে দশটা করে দেয়। বিকাশ তেমনটি নয়। কোনও দিন তার লেট হয় নি, বরং পাঁচ দশ মিনিট আগে 'দত্ত ম্যানসন'-এর সামনে হাজির হয়ে যায়।

বিকাশ সসম্ভ্রমে পেছন দিকের দরজা খুলে দেয়। সুজাতা উঠে বসলে দরজা বন্ধ করে নিজের সিটে গিয়ে বসে স্টার্ট দেয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঝকঝকে চেহারার মারুতি-এসটিম সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে চলে আসে।

অফিস টাইম শুরু হয়ে গেছে। বাস মিনিবাস আর প্রাইভেট কার স্রোতের মতো ছুটছে। কলকাতার সব বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট — ডালহৌসি, পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট বা সার্কুলার রোডের দিকে।

প্রচুর গাড়ি, প্রচুর মানুষ। রাস্তা থেকে উঠে আসছে একটানা পাঁচমেশালি আওয়াজ। তীব্র গতিতে ধেয়ে-চলা যানবাহনের, মানুষের কণ্ঠস্বরের। চারদিকে তুমুল ব্যস্ততা, চারদিকে হইচই। মহানগর এখন সরগরম।

অন্যমনস্কর মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল সুজাতা। ভিড়, ট্রাফিক, রাস্তার দু'ধারের বিশাল বিশাল ইমারত--কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না সে। সব ছাপিয়ে চোখের সামনে এখন 'দত্ত ম্যানসন'-এর ক'টি মানুষ আর টুকরো টুকরো নানা দৃশ্য। তার বেডরুমের দেওয়ালে অঞ্জনের জীবন্ত ছবি, শ্যামা, বিনোদিনী, সোনা। কিন্তু কয়েক মাস বাদে বাবুনের চেহারায় পাগলামির চিহ্ন ফুটে উঠছে আর যাঁর দাপটে সারা বাড়ি সর্বক্ষণ তটস্থ সেই স্বর্ণলতা বিছানায় নির্জীব পড়ে আছেন — এই দু'টো ঘটনা তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না, বুকের ভেতরটা ভরে যাচ্ছে উদ্বেগে।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, একসময় সব ঠেলে সরিয়ে সুজাতার সমস্ত ভাবনা দখল করে নেয় রজতাভ। 'দত্ত ম্যানসন'-এর বাসিন্দাদের মুখগুলো ক্রমশ ফিকে হতে হতে দূরে বিলীন হয়ে যায়। চোখের সামনে এখন শুধুই রজতাভ। কিন্তু রজতাভর কথা ভাবতে গিয়ে আগে নিজের কথা মনে পড়ছে সুজাতার। কোনও আশ্চর্য টাইম মেশিন তাকে কয়েক বছর পিছিয়ে নিয়ে যায়। ...

সুজাতারা থাকত ভবানীপুরে। তাদের ছোট্ট পরিবার। সব মিলিয়ে পাঁচজন। মা মৃণালিনী, দাদা অশোক, বৌদি পারমিতা, ওদের একমাত্র ছেলে রুকু আর সুজাতা। সে যখন এম.এ পড়ছে সেই সময় তার বাবা মারা যান।

অশোক এবং সুজাতা, দু'জনেই ছাত্র হিসেবে দুর্দান্ত। আগাগোড়া চোখধাঁধানো রেজাল্ট তাদের। অশোক চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সি করার পর একটা বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যায়। বিশাল অঙ্কের মাইনে, অঢেল পার্কস। বৌদি পারমিতা একটা কলেজে ইংরেজি পড়াত।

ইকনমিকসে এম.এ করে কম্পিউটারে ডিগ্রি নেবার সঙ্গে সঙ্গে ফরেন ব্যাঙ্কের একজিকিউটিভ পোস্টে চাকরির অফার পায় সুজাতা। সেটাই এখনও করে চলেছে।

চাকরিতে জয়েন করার পর ঝড়ের গতিতে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে যায় সুজাতার জীবনে। অভাবিত এবং চমকপ্রদ। এক বান্ধবীর বিয়ের রিসেপশনে গিয়ে অঞ্জনের সঙ্গে তার আলাপ। অঞ্জন এমন একটি যুবক, যার সমস্ত ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো। হাতে বেশি সময় নেই, অথচ প্রচুর কাজ। যা করার চটপট সেরে ফেলতে হবে, এরকমই ভাবসাব।

আলাপের পর নিশ্বাস ফেলতে দেয় নি অঞ্জন। সাতদিন চুটিয়ে প্রেম। একমাস কাটতে না কাটতেই বিয়ে। সবটা যেন ঘোরের মধ্যে ঘটে গেছে। বিয়ের চার মাসের মাথায় মায়ের মৃত্যু হল। তাঁর বয়স হয়েছিল, অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন, বেডসোর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যু না হয় মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এর আট মাস বাদে হিমালয়ে ট্রেকিং করতে গিয়ে যখন অঞ্জনের ডেডবডি ফিরে এল, একেবারে ভেঙে পড়েছিল সুজাতা। শুধু সে-ই না, 'দত্ত ম্যানসন'-এর বাকি সবাইও। অমন যে প্রবল দাপুটে স্বর্ণলতা, তিনি তিন দিন একটানা কেঁদে গেছেন। এক ফোঁটা জলও এ ক'দিন তাঁকে খাওয়ানো যায় নি।

শোক ধীরে ধীরে কমে আসে। সময়ের হাতে এমন এক জাদু আছে যা দুঃখ, মানসিক ক্লেশ বা সন্তাপ—সমস্ত কিছুর তীব্রতা জুড়িয়ে দেয়। 'দত্ত ম্যানসন' ফের স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

অঞ্জনের মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের সুতোটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছা করলে সুজাতা এখান থেকে কবেই চলে যেতে পারত। দাদা অশোকও চাইছিল, সে তার কাছে ফিরে যাক। বৌদি পারমিতাও খুবই ভালো

মানুষ। উদার, সহৃদয়, সহানুভূতিশীল। সেও চেয়েছে সুজাতা তাদের কাছে গিয়েই থাকুক। শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ নিয়েও ওরা ভেবে যাচ্ছিল।

চব্বিশ বছর বয়সে সুজাতার দাম্পত্য জীবন শুরু, পঁচিশে শেষ। সে ভালো চাকরি করে, আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী। দাদা-বৌদিও তাকে অপার মায়ায় ঘিরে রাখবে, কিন্তু এই বয়সের একটি মেয়ের পক্ষে সেটাই সব নয়। তার সামনে অফুরান ভবিষ্যৎ। প্রতিটি মেয়েই চায়, একটি প্রিয় পুরুষকে নিয়ে আলাদা একটু পৃথিবী গড়ে তুলতে। সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। দাদা-বৌদি ভেবে রেখেছিল, আপাতত কিছুদিন সুজাতা তাদের কাছে থাক, মন আরেকটু স্থির হোক। তারপর বিয়ে করুক। নিজের পছন্দমতো কাউকে পেলে ভালোই। নইলে অশোক আর পারমিতাই ব্যবস্থা করবে। সুজাতা একবার 'হ্যাঁ' বললে, তার মতো সুন্দরী, শিক্ষিত, সপ্রতিভ, দামি চাকরি-করা মেয়ের জন্য সৎপাত্রের অভাব হবে না।

কিন্তু সেই সময় নিজের মধ্যেই কোথাও একটা দ্বিধা ছিল সুজাতার। অঞ্জনের মৃত্যুশোকের আচ্ছন্নতা খানিকটা কাটিয়ে উঠলেও তার রেশ মুছে যায়নি। মাত্র একটি বছর অঞ্জনের সঙ্গে কাটিয়েছে সে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, যেন কত আলোকবর্ষ। তখন সারাক্ষণ সমস্ত স্মৃতি জুড়ে অঞ্জন। তাকে ভোলা যাচ্ছিল না। তা ছাড়া, একটি শোকার্ত পরিবারকে, বিশেষ করে স্বর্ণলতা এবং নিশানাথকে বলা যায়নি, 'আমি চলে যাব।' ওদিকে অশোক অবিরল তাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। 'যাচ্ছি, যাব—' করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল সুজাতা।

এইভাবে আরও বছরখানেক পেরিয়ে গেল। তারপর হঠাৎই অশোকের কাছে একটা মস্ত সুযোগ এসে যায়। একটা আমেরিকান কোম্পানি তাকে বিরাট অফার দিল। সে যা স্যালারি পেত, এটা তার দশ বারো গুণ। তা ছাড়া, অজস্র বেনিফিট। তবে শর্ত একটাই, তাকে ফ্যামিলি নিয়ে আমেরিকায় চলে যেতে হবে।

অশোক সুযোগটা হাতছাড়া করল না। বোনকে বোঝাল, তারা শিগ্‌গিরই চলে যাচ্ছে। সুজাতার যা কোয়ালিফিকেশন, আমেরিকার যে কোনও ব্যাঙ্ক তাকে লুফে নেবে। সে সেখানে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসেই সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলবে। সুজাতা যেন পাসপোর্ট করে রাখে।

অশোকরা আমেরিকায় চলে গেল। সেখান থেকে দু-এক দিন পর পর ফোন করত। রক্তের সম্পর্ক বলতে একটা মাত্রই বোন তার। পৃথিবীর দুই গোলার্ধে, হাজার হাজার মাইল দূরে, তারা পড়ে আছে। সুজাতার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে

থাকত। মাস ছয়েক বাদে অশোক জানাল, একটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। সুজাতা আমেরিকায় এলেই কাজটা হয়ে যাবে। তার সেখানে যাবার যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দেবে সে।

কলকাতা থেকে চলে যাবার সময়ই পাসপোর্ট করে রাখতে বলেছিল অশোক। কিন্তু সেটা করা হয়ে ওঠেনি। আমেরিকায় যাবে কি যাবে না, তা নিয়ে মনস্থির করতে পারছিল না সুজাতা। 'দত্ত ম্যানসন' থেকে সে চলে যেতেই পারে। অঞ্জনের মৃত্যুর পর মনে হয়েছিল, এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের গিঁট আলগা হয়ে গেছে। কিন্তু যখন চলে যাবার কথা ভেবেছে, টের পেয়েছে, সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। বোধ হয় অভ্যাস। সে তো 'দত্ত ম্যানসন'-এ বেড়াতে আসেনি, যে কয়েকদিন থাকলাম, তারপর হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেলাম। অঞ্জন নেই, কিন্তু তার মা বাবা ভাই বোনরা রয়েছে। তাদের সঙ্গে সূক্ষ্ম বন্ধনে সে বুঝিবা জড়িয়ে গেছে। নিশানাথ বাবুন বা বিনোদিনী ধর্তব্যের মধ্যেই নেই। দু'জন রোগী, একজন পার্থিব সমস্ত ব্যাপারেই উদাসীন। সোনা ছেলেমানুষ। সংসারে কোনও সমস্যা দেখা দিলে স্বর্ণলতা সুজাতার সঙ্গেই যা কিছু পরামর্শ করেন। তার ওপর নানা ব্যাপারে তিনি নির্ভরশীল।

অশোক যতবার পাসপোর্টের কথা বলেছে, সুজাতা জানিয়েছে, এবার করে নেবে। ব্যাঙ্কের কাজটা ঠিক করে ফেলার পর রেগে গিয়েছিল সে, 'করে নেব, করে নেব' করে তো ছ'মাস কাটিয়ে দিলি। আমি আর কোনও কথা শুনব না।'

'ঠিক আছে, দেখছি।'

ব্যস, ওই পর্যন্তই। পাসপোর্ট অফিস অব্দি তার যাওয়া হয় নি।

সময় নিজের নিয়মেই এগিয়ে যায়।

হঠাৎ একদিন দুপুরে একটি যুবক অফিসে তার চেম্বারে দেখা করতে এল। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। পেটানো স্বাস্থ্য, বাদামি রং, লম্বাটে মুখ, দৃঢ় চোয়াল। চুল ব্যাকব্রাশ-করা। সমস্ত চেহারায় প্রবল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। রিসেপশন থেকে যে ভিজিটরস স্লিপ পাঠানো হয়েছে তাতে নামটা লেখা ছিল : রজতাভ নন্দী।

সুজাতাদের অফিস সেন্ট্রালি এয়ার-কনডিশনড। তার কামরাটা চমৎকার সাজানো। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবলের এধারে ভিজিটরদের জন্য ছ'টা আরামদায়ক চেয়ার। রজতাভকে বসতে বলে সে জিগ্যেস করেছে, 'বলুন মিস্টার নন্দী, আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

রজতাভ বলেছে, 'আমাকে জানানো হয়েছে, আপনি বিজনেস বা স্মলস্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাঙ্ক লোনের দিকটা দেখেন—'

'হ্যাঁ। আমি প্রিলিমিনারি কাজটা করে আমার হায়ার অথরিটিকে রিপোর্ট পাঠাই। লোন স্যাংসন করার দায়িত্ব তাঁদের।'

'আমি লোনের ব্যাপারেই এসেছি। তার আগে নিজের কথা একটু বলতে চাই। সময় হবে?'

ঘড়ি দেখে সুজাতা বলেছে, 'এখন একটা বেজে সতেরো। পনেরো মিনিট, মানে একটা বত্রিশ পর্যন্ত সময় আপনাকে দিতে পারি।'

রজতাভর গলার স্বর একটু ভারী ধরনের। সে জোর দিয়ে বলেছে, 'যথেষ্ট। আশা করি তার আগেই আমার সম্বন্ধে আপনার একটা ধারণা হয়ে যাবে।'

রজতাভ জানিয়েছে, সে পিলানি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল। রেজাল্টটা মোটামুটি ভালোই হয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড। ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টে চাকরি পেয়ে কিছুদিন বাঙ্গালোর, কিছুদিন মুম্বাইতে দু'তিনটে কোম্পানিতে কাজ করেছে। তারপর পাড়ি দিয়েছিল মিডল ইস্টে। সেখান থেকে জার্মানি। টাকাপয়সা অঢেল, আরামের ব্যবস্থা বিপুল। সে-সব নিয়ে ক্ষোভ নেই। কিন্তু মাথার ভেতর সেই ছাত্র বয়স থেকেই অদৃশ্য একটা পোকা কুটুর কুটুর কামড় বসিয়ে যাচ্ছিল। পরের গোলামি নয়, নিজস্ব কিছু একটা গড়ে তুলবে।

সে উড়নচণ্ডে ধরনের নয়। ইন্ডিয়া থেকে ছেলেমেয়েরা ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে মোটা টাকা রোজগার করতে পারলে তাদের ডানা গজিয়ে যায়। সেখানে কত রকমের প্রলোভন। নাইটক্লাব বান্ধবী এবং আরও হাজার রকমের ফাঁদ। পয়সা উড়ে যায় খোলামকুচির মতো। কিন্তু সামান্য মদ্যপান বাদ দিলে বাজে খরচ তার ছিল না বললেই চলে। একমাত্র বিধবা মা ছাড়া কেউ নেই। না বাবা, না অন্য কোনও ভাইবোন। রজতাভ যখন জার্মানিতে, মাকে এক দূর সম্পর্কের পিসির বাড়ি রেখে দিয়েছিল। পিসিরা চমৎকার মানুষ। মাকে তাঁরা খুব যত্ন করতেন। অবশ্য তাঁর যাবতীয় খরচ টরচ রজতাভই পাঠিয়ে দিত। কিন্তু সে আর ক'টা পয়সা!

কলকাতার ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউন্ট ছিল। ফি মাসে মোটা টাকা সেখানে পাঠিয়ে দিত। কয়েক বছর চাকরি করার পর প্রচুর জমে গিয়েছিল। রজতাভর মনে হয়েছে, স্বপ্নপূরণের এটাই সেরা সময়। তার ইচ্ছা একটা যন্ত্রপাতির

কারখানা বসায়। জার্মানি বা ইউরোপের যে কোনও দেশে সেটা খুব সহজেই করা যেত।

ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েরা বিদেশে গেলে তাদের মুণ্ডু ঘুরে যায়। সেখানকার জলুস, সেখানকার দুরন্ত গতির জীবন তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কেউ আর দেশে ফেরার কথাও ভাবে না। এদের মাথা থেকে দেশের নামগন্ধ বেমালুম উবে যায়। কিন্তু রজতাভর ধাতটা আলাদা, সে একটু সৃষ্টিছাড়া ধরনের ছেলে। দেশে বিদেশে নানা জায়গায় সে কাজ করেছে। যেখানেই যাক, শিকড়ের টানটা সব সময়ই অনুভব করত। সে ভাবত, যদি কিছু করতেই হয়, পশ্চিমবঙ্গেই করবে। এখানে লক্ষ লক্ষ বেকার। যদি বিশ পঞ্চাশটা যুবককে চাকরি দেওয়া যায় তাদের পরিবারগুলো বেঁচে যাবে।

একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে হুট করে কলকাতায় চলে এল রজতাভ। টালিগঞ্জে তাদের নিজেদের যে দোতলা বাড়িটা রয়েছে, তার একতলাটা এতদিন ভাড়া দেওয়া ছিল, দোতলাটা তালাবন্ধ। পিসির বাড়ি থেকে মাকে সেখানে নিয়ে এল সে। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কাজের লোক রাখা হল।

মা আর ছেলের ছোট্ট সংসার। সেটা গুছিয়ে নেবার পর আসল কাজে নেমে পড়ল রজতাভ। হাওড়ায় দিল্লি রোডের ধারে নিজের জমানো টাকা দিয়ে খানিকটা জমি কিনে ফেলে সে। তারপর সরকারের নানা দপ্তরে চার পাঁচ মাস অবিরাম ধরনা দেবার পর কারখানা তৈরির অনুমতি আদায় করল। এ এমন এক রাজ্য যেখানে সব ব্যাপারেই গড়িমসি। সর্বত্র গয়ংগচ্ছ ভাব। এক টেবল থেকে আরেক টেবলে, এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টে কত দামি সময় যে এখানে নষ্ট হয়ে যায়! সময় যে একটা বিরাট ব্যাপার সেটা এ-রাজ্যে কেউ প্রায় বুঝতেই চায় না। পৃথিবী যখন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলে, তখন এখানে সব কিছু প্রায় নিশ্চল, স্থবির। রজতাভ যে অনুমতি-পত্রটা চার পাঁচ মাসের ভেতর পেয়ে গেছে সেটা লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার মতো ঘটনা।

জমি কেনার পর এমন টাকা রজতাভর হাতে ছিল না যা দিয়ে কারখানা শুরু করা যায়। লোন দরকার। নানা জায়গায় হানা দিয়ে, কারা কোন শর্তে, কত পারসেন্ট ইন্টারেস্টে লোন দিতে চায়, সব জেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সুজাতাদের ব্যাঙ্কে এসেছে।

পনেরো মিনিট সময় দিয়েছিল সুজাতা। কিন্তু কখন যে চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, খেয়াল ছিল না। রজতাভর কথা শুনতে শুনতে সে যতটা

অবাক হয়েছে, ততটাই মুগ্ধ। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ছাড়া আজকালকার যুবক যুবতীরা অন্য কোনও দিকে তাকায় না। এরা স্বার্থপর, আগাপাশতলা আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু তার টেবলের ওধারে যে তরুণটি বসে ছিল, সে তুড়ি মেরে জার্মানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। মাসের শেষে মোটা অঙ্কের চেক, গাড়ি, বাংলো, অজস্র আরাম, প্রভূত নিরাপত্তা— কোনও কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারেনি। দাসত্ব করা তার ধাতে নেই। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের কথা সে ভাবে, এই ব্যাপারটা সুজাতাকে অভিভূত করে দিয়েছিল।

নিজের কথা শেষ করে হেসেছিল রজতাভ। তার হাসিটা খোলসা ধরনের। ভেতরে কোনও রকম চাতুরি থাকলে এমন হাসি কারও মুখে ফোটে না। সে বলেছিল, 'এই হচ্ছে আমার থার্টি ফাইভ ইয়ারসের লাইফ হিস্ট্রি আর ছোট্ট একটা ড্রিম। এখন কাইন্ডলি বলুন, আমাকে কি সাহায্য করতে পারবেন?'

কিছুক্ষণ পলকহীন রজতাভর দিকে তাকিয়ে থেকেছে সুজাতা। তারপর বলেছে, 'আশা করি, পারব। তবে—'

'তবে কী?'

'ব্যাঙ্ক নানা কাগজপত্র দেখতে চাইবে। যেমন আপনার জমির ডকুমেন্ট, ফ্যাক্টরি তৈরির সরকারি পারমিশন, নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট ফ্রম এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট—এই সব।'

রজতাভ বলেছে, 'জানি। সমস্ত কিছুই মোটামুটি তৈরি করা আছে। তা ছাড়া আরও যা যা দরকার হবে সেগুলোও আশা করি দিতে পারব।'

'কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকলে ব্যাঙ্ক থেকে লোক গিয়ে আপনার জমি ইনসপেকশন করে আসবে।'

'অবশ্যই। মোস্ট ওয়েলকাম—'

এরপর প্রায়ই সুজাতাদের ব্যাঙ্কে আসতে লাগল রজতাভ। সুজাতা অনেক ধরনের ফর্ম দিয়েছে. সেগুলোতে নানা ব্যাপার জানতে চাওয়া হয়েছে। কীভাবে ফর্মগুলো ফিল-আপ করবে, সামনে বসিয়ে বলে দিয়েছে সে। আর সেইমতো লিখে গেছে রজতাভ।

অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় অঞ্জনকে একদিন সুজাতার ভালো লেগেছিল তার দুর্দান্ত সাহসের জন্য। তার প্রাণখোলা আমুদে স্বভাবের জন্য। হিমালয়ের দুর্গম দুর্গম এলাকায় অভিযান করতে তার বুক একটুও কাঁপত না। রজতাভও প্রচণ্ড

সাহসী। সেও অন্য ধরনের বিরাট অ্যাডভেঞ্চারের জন্য পা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিদেশের বিশাল মাইনের নিরাপদ চাকরি হেলায় ছেড়ে দিয়ে যে পশ্চিমবঙ্গের মতো অনন্ত ঝামেলার জায়গায় কারখানা বসাতে চায়, তার বুকের পাটা আছে। তা ছাড়া অঞ্জনের মতো অতটা হুল্লোড়বাজ না হলেও সেও বেশ হাসিখুশি। মজাটজা করতে ভালোবাসে। তার খোলামেলা স্বভাবের মধ্যে এক ধরনের ছেলেমানুষি এবং সারল্য রয়েছে। ব্যাঙ্কে নিয়মিত যাতায়াতের কারণে নিজের অজান্তে তার প্রতি একটা চোরা টান অনুভব করতে শুরু করেছিল সুজাতা। তাদের ব্যাঙ্কে কম করে তিন, সাড়ে তিন হাজার কাস্টোমারের অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এদের কারুকে কারুকে সে চেনে। অনেকেই মুখ-চেনা। কিন্তু রজতাভ তাদের সবার থেকে আলাদা। তাকে সাহায্য করতে পেরে ভেতরে ভেতরে খুশি হচ্ছিল সে।

রজতাভ কাগজপত্র এবং ফিল-আপ করা ফর্মগুলো একটা ঝকঝকে সুদৃশ্য ফাইলে ভরে জমা দেবার পর সুজাতা নিজে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এটা তার কাজ নয়। এ-সব ফাইল বেয়ারারাই নিয়ে যায়।

ম্যানেজার দক্ষিণ ভারতীয়। পদবি মেনন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং নিজের কাজে শতকরা একশ' ভাগ পারদর্শী। সুজাতাকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। কেননা সুজাতা কাজে ফাঁকি দেয় না, অফিসে বসে গালগল্প করে সময় নষ্ট করে না। তুখোড় অফিসার হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম।

ম্যানেজার রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ফাইলটা উলটে পালটে দেখে বলেছেন, 'কী ব্যাপার, তুমি এটা নিয়ে এলে যে!'

সুজাতা বলেছিল, 'স্যার, এই অ্যাপ্লিকান্টের লোনটা একটু তাড়াতাড়ি বার করে দিলে ভালো হয়।'

ম্যানেজার হালকা হেসে বলেছেন, 'যারাই লোনের জন্যে অ্যাপ্লাই করে তারাই চায় যত তাড়াতাড়ি হয় টাকাটা যেন ব্যাঙ্ক দিয়ে দেয়।'

'এই কেসটা একটু ডিফারেন্ট।'

'কী কারণে ডিফারেন্ট? ফ্যাক্টরি তো অনেকেই করতে চায়। তেমন লোন অ্যাপ্লিকেশন তো মাঝে মাঝেই আমরা পাই।'

অন্যদের সঙ্গে তফাতটা কোথায়, শুধু প্রফিট-মেকিং বা টাকা কামানোই যে রজতাভর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—সব জানিয়ে দিয়েছিল সুজাতা।

ম্যানেজার বলেছেন, 'আই সী। এই জন্যেই তোমার এত ইন্টারেস্ট?'

সুজাতা আস্তে মাথা নেড়েছে।

ম্যানেজারের মুখে হাসি লেগেই ছিল। তিনি বলেছেন, 'ঠিক আছে সুজাতা। কিন্তু তুমি তো জানো, সমস্ত কিছু প্রসেস করতে মিনিমাম কয়েক মাস সময় লাগে—'

'জানি স্যার—'

'তবু তোমার স্পেশাল কেস হিসেবে বিশেষ ইমপর্টান্স দিয়ে এটা আমি দেখব। যত তাড়াতাড়ি এটা ক্লিয়ার করা যায়, চেষ্টা করব।'

স্পেশাল কেস! ম্যানেজার কি তার আগ্রহ দেখে কোনও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? ভেতরে ভেতরে সামান্য বিব্রত বোধ করলেও যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করেছে সুজাতা। নিজেকে বুঝিয়েছে, একটি উদ্যমশীল বাঙালি যুবক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঝেড়ে ফেলে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে দেশে ফিরে কিছু একটা গড়ে তুলতে চাইছে, তাকে সবারই তো সাহায্য করা উচিত। সেও ঠিক সেটাই করতে চাইছে। তার বেশি কিছু নয়। এর মধ্যে অসঙ্গত, অন্যায় কী-ই বা থাকতে পারে?

এদিকে দু-চারদিন পর পরই ব্যাঙ্কে আসতে লাগল রজতাভ। তার তর সইছিল না।

সুজাতা হেসে হেসে বলেছে, 'আপনাকে তো বলেছি হয়ে যাবে। তবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'

রজতাভও হেসেছে, 'আমার ধৈর্যটা খুব কম। তা ছাড়া যখনই আসি, দেখতে পাই আপনার ওপর ভীষণ কাজের প্রেসার। যদি আমার কেসটা ভুলে যান, তাই মাঝে মাঝে এসে হাজির হই।'

'ভোলার কোনও প্রশ্নই নেই। ম্যানেজারের কাছে যদিও আপনার ফাইলটা পাঠিয়ে দিয়েছি, তবু প্রসেসের কাজ কতটা এগুচ্ছে, খোঁজ নেবার জন্যে দু-তিন দিন পর পর তাঁর কাছে যাচ্ছি। আপনার টেনশনের কারণ নেই।'

'জানি, আমার কেসটার দিকে আপনার নজর আছে। তবু না এসে পারি না। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি একটু ইমপেশেন্ট টাইপের। যতক্ষণ না লোনের টাকাটা হাতে আসছে, রাত্তিরে ঘুম হয় না।'

সুজাতা বলেছে, 'আমি অ্যাসুয়ার করছি, টাকাটা আপনি পাবেন। এত আসার দরকার নেই। নিশ্চিন্ত মনে বাড়িতে ঘুমোতে পারেন।'

কিছুক্ষণ কী ভেবে রজতাভ জিগ্যেস করেছে, 'আমি প্রায়ই এসে জ্বালাচ্ছি। খুব বিরক্ত হন, তাই না?'

'কী আশ্চর্য, বিরক্ত হব কেন!'

'তা হলে আমি আসব।'

'আপনার যখন সেরকমই ইচ্ছে—আসবেন।'

নিয়মিত আসা-যাওয়ার কারণে দু'জনে অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছিল। কবে থেকে তারা পরস্পরকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে, নিজেদেরই খেয়াল নেই।

মনে পড়ে, একদিন ব্যাঙ্কের ছুটি অব্দি রজতাভ তার কামরায় বসে ছিল। নিজের অ্যাটাচি কেস গোছাতে গোছাতে সুজাতা মজার গলায় বলেছে, 'তুমি কি এখানে আজকের রাতটা থাকতে চাও? তা হলে বল ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাকে কিন্তু বাড়িতে ফিরতে হবে।'

রজতাভ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'এখানে থাকব মানে? আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

সুজাতা চমকে উঠেছে। 'কোথায় যাবে? আমাদের বাড়ি?'

রজতাভ হেসে ফেলেছে।—'আরে না না, তোমাকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় যাব।'

সুজাতার চমকের সঙ্গে এবার বিস্ময় মিশেছে। সে বলেছে, 'রেস্তোরাঁয়—কেন?'

'রেস্তোরাঁয় লোকে কী করতে যায়? চা খেতে খেতে তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করব।'

'আমার এখানে বসে এতক্ষণ তো বক বক করলে। তারপরেও গল্প!'

'প্লিজ, চল না—'

রজতাভকে যতটুকু দেখেছে, তাতে মনে হয়েছে, ছেলেটার মধ্যে কোনও রকম নোংরামি নেই। সরল, অকপট। তবু একটু অস্বস্তি যে হচ্ছিল না তা নয়। কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে কফি হাউসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়েছে। অঞ্জনের সঙ্গে বিয়ের পর বড় বড় রেস্তোরাঁ বা হোটেলেও গেছে। কিন্তু সে-সব একরকম। স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য-চেনা একটি যুবকের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় যাওয়াটা পুরোপুরি আলাদা।

সুজাতা স্মার্ট, শিক্ষিত মেয়ে। কোনও রকম সংস্কার তার নেই। শালীনতা আর সম্ভ্রম বজায় রাখার কৌশল বা শক্তি তার যথেষ্টই রয়েছে। আত্মবিশ্বাসও প্রবল। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে সে বলেছে, 'ঠিক আছে, যেতে পারি। তবে আধ ঘণ্টার বেশি থাকতে পারব না।'

'এনাফ, এনাফ—'

রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাবার পর চা এবং স্ন্যাকসের অর্ডার দিয়ে শুরু করেছিল রজতাভ। নতুন কিছু নয়। সেই পুরনো কথা। তার কারখানায় কী কী প্রোডাক্ট তৈরি হবে তার লম্বা তালিকা ফের আরেক বার দিয়েছিল। এই সব জিনিসের জন্য নাকি বিশাল ডোমেস্টিক মার্কেট যেমন রয়েছে তেমনি রজতাভর প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিও প্রচুর। কঠিন প্রতিযোগিতা। তাই বিপণনটা করতে হবে একেবারে আদা-জল খেয়ে। মার্কেটিংয়ের জন্য একজন দক্ষ ম্যানেজারকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে সে। ঢিলেঢালা কোনও ব্যাপার নয়। সমস্ত কিছুই সে করবে প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। দেশের বাজারটা ধরার পর নজর দেবে বিদেশের দিকে। তাদের যে-সব জিনিস তৈরি করবে, মিডল-ইস্ট আর ইউরোপের বেশ ক'টা দেশে তার ভালো মার্কেট আছে। সেখানে যদি একবার তাদের প্রোডাক্টের চাহিদা হয় তাহলে আর দেখতে হবে না। সাফল্যের চূড়োয় পৌঁছে যাবে তারা।

রজতাভ তার স্বপ্নপূরণের কথা বলে গিয়েছিল আর মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিল সুজাতা। আধ ঘণ্টা সময় চোখের পলকে কখন কেটে গেছে সে টের পায়নি। রজতাভ কিন্তু ভুলে যায়নি। ততক্ষণে চা'টা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'তোমার কাছে হাফ অ্যান আওয়ার চেয়েছিলাম। সময় শেষ। এবার ওঠা যাক।'

সেই শুরু। তারপর প্রায়ই সুজাতাকে ছুটির পর একসঙ্গে খানিকটা সময় কাটাবার জন্য রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে লাগল রজতাভ। তার স্বপ্নের পরিধি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। আপাতত ছোট মাপের একটা কারখানা তৈরি করছে ঠিকই, চল্লিশ পঞ্চাশ জনের বেশি লোক সে নিতে পারবে না। তবে তার ধারণা—ধারণা কেন, দৃঢ় বিশ্বাস—দু'বছরের মধ্যে কারখানাটা দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর এক্সপ্যানসনের কাজে হাত দেবে। তখন আরও লোকের এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করতে পারবে।

একদিন রজতাভ বলেছিল, 'জানো সুজাতা, এখন থেকেই একটা ফিউচার প্ল্যানের কথা ভাবছি।'

সুজাতা জানতে চেয়েছে, 'কীরকম?'

'আমি ফ্যাক্টরির জন্যে যে জমিটা কিনেছি সেটা খুব একটা বড় নয়। এক্সপ্যানসন করলেও তেমন বেশি কিছু করা যাবে না। এদিকে জমির দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। তাই ধার টার করে আরও অনেকটা ল্যান্ড কিনে রাখব।'

'ওই ল্যান্ডটা দিয়ে কী করবে?'

রজতাভ জানিয়েছে, জার্মানিতে কাজ করার সময় সেখানকার বিরাট বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল। আজকাল ইন্ডিয়ায় তো আকছার জয়েন্ট ভেনচার হচ্ছে। জার্মানির কোনও একটা কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনে নতুন জমিটায় সে বিশাল আকারের একটা কারখানা করবে।

স্বপ্নদর্শী যুবকটির ছেলেমানুষিতে হেসে ফেলেছে সুজাতা।-- 'এখনও ব্যাঙ্ক লোন পাওনি। সেটা পাবে, তারপর তোমার প্রথম ফ্যাক্টরি তৈরি হবে। তার প্রোডাক্ট বাজারে চললে এক্সপ্যানসন নিয়ে মাথা ঘামাবে। সে জন্যে আমার মনে হয়, মিনিমাম তিন চার বছর লেগে যাবে। আর তুমি কিনা এর মধ্যেই নতুন একটা ফ্যাক্টরির কথা ভাবতে শুরু করে দিলে!'

রজতাভ বলেছে, 'আরে বাবা, বড় কিছু করতে হলে একটা ভিশন থাকা চাই। চোখের সামনে একটা লক্ষ্য, একটা স্বপ্ন না থাকলে এগিয়ে যাব কী করে?'

রজতাভকে যত দেখছিল ততই ভালো লাগছিল। এমন টগবগে, উদ্যোগী একটি যুবক আগে তার চোখে পড়েনি। হ্যাঁ, তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে অঞ্জনের স্মৃতি। তবু রজতাভ সম্পর্কে এমনটাই মনে হয়েছে।

একদিন বিভোর হয়ে তার কারখানা টারখানা নিয়ে কথা বলতে বলতে আচমকা অন্য একটা প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিল রজতাভ, 'আচ্ছা, আমাদের কত দিন হল আলাপ হয়েছে?'

এ-রকম একটা প্রশ্নে সুজাতা অবাক হয়েছে ঠিকই, তবে বলেছে, 'কেন, তোমার খেয়াল নেই?'

লঘু সুরে রজতাভ বলেছে, 'আছে। দু'মাস। কিন্তু মনে হয় যেন দু'বছর।'

সুজাতা উত্তর দেয়নি। শুধু হেসেছে।

রজতাভ এবার বলেছে, 'এতদিনের পরিচয়। আমার সমস্ত কথা, মানে লাইফ-হিস্ট্রি তোমাকে বলেছি। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।'

'না জানার কী আছে? দেখছই তো আমি একজন ব্যাঙ্ক অফিসার।'

'নো ম্যাডাম। তোমার ফ্যামিলিতে কে কে আছে, তোমরা কোথায় থাকো—কিছুই শোনা হয়নি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল সুজাতা। তারপর ধীরে ধীরে নিজের উনত্রিশ বছরের জীবনের সব খুঁটিনাটি জানিয়ে দিয়েছে। কিছুই বাদ দেয়নি।

শোনার পর মাথা নিচু করে বসে থেকেছে রজতাভ। তারপর চোখ তুলে,

মলিন মুখে বলেছে, 'আই অ্যাম সরি। তোমার লাইফ এভাবে তছনছ হয়ে গেছে, ভাবা যায় না।' তার গলার স্বরে অপার সহানুভূতি।

সেদিন আর কোনও কথা হয়নি।

মনে পড়ে, আরও সপ্তাহখানেক কি সপ্তাহ দেড়েক বাদে রজতাভ বলেছিল, 'জানো, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর মাকে তোমার কথা বলেছিলাম।'

সচকিত সুজাতা জিগ্যেস করেছে, 'কী বলেছিলে?'

'তুমি আমাকে কীভাবে সাহায্য করছ, তোমার হেল্প না পেলে লোনটা কোনও ভাবেই তাড়াতাড়ি বেরুবার সম্ভাবনা নেই—এই সব।'

'আমি এমন কিছুই করছি না। কাস্টোমারকে সাহায্য করাই তো আমার কাজ।'

'তুমি কী করছ সেটা আমি জানি। আই অ্যাম সো গ্রেটফুল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর গভীর আগ্রহে রজতাভ বলেছে, 'জানো, মা তোমাকে খুব দেখতে চায়। বুড়ো মানুষটাকে তো ব্যাঙ্কে নিয়ে আসতে পারি না। একদিন যাবে আমাদের বাড়ি?'

এবার সতর্ক হয়ে গিয়েছিল সুজাতা। সে বলেছে, যে কাস্টোমার লোনের দরখাস্ত করেছে তার সঙ্গে এমনিতেই রেস্তোরাঁয় যাওয়াটা ঠিক নয়। রজতাভর অনুরোধ এবং চাপাচাপি এড়ানো যায় না বলে যেতে হয়। এটাই যথেষ্ট ঝুঁকির ব্যাপার। তার ওপর যদি সুজাতা ওদের বাড়ি যায় আর সেটা জানাজানি হয়, সে ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে।

হতবুদ্ধি রজতাভ জিগ্যেস করেছে, 'কিসের বিপদ?'

'এই যে তোমার সঙ্গে এত মেলামেশা করছি, এমনকি তোমার বাড়ি অব্দি যাচ্ছি, এতে নিশ্চয়ই আমার কিছু ইন্টারেস্ট আছে।'

'কী ইন্টারেস্ট? মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝছি না।'

সুজাতা বুঝিয়ে দিয়েছিল। লোন পেতে অন্য কাস্টোমারের যেখানে ছ' সাত মাস লাগে, সেখানে তার তদবিরে রজতাভ যদি দু-তিন মাসে পেয়ে যায়, ব্যাঙ্কের লোকেরা ধরে নেবে, লোনের একটা পারসেন্টেজ পাবে সুজাতা। তার পরিষ্কার অর্থ হল ঘুষ।

চমকে উঠেছে রজতাভ, 'কী বলছ তুমি!'

আস্তে মাথা নেড়েছে সুজাতা, 'ঠিকই বলছি।'

'ব্যাঙ্ক লোন তো অফিসের ব্যাপার। তার বাইরে কি মানুষের সম্পর্ক থাকতে নেই?'

সুজাতা উত্তর দেয়নি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রজতাভ বলেছে, 'তোমার প্রবলেমটা বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, এখন যেতে হবে না।'

রজতাভর মন যে খারাপ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পেরে সুজাতা বলেছে, 'লোনটা বেরিয়ে যাক। তারপর একদিন গিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসব।'

এবার খুশি হয়েছে রজতাভ। 'থ্যাঙ্ক ইউ—'

দু'মাস সাতাশ দিনের মাথায় লোন বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর শুরু হয়েছিল কারখানা বানানোর কাজ। একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। এই সময়টা ব্যাঙ্কে এসে সুজাতার সঙ্গে আগের মতো দেখা করতে পারত না রজতাভ। তবে রোজই মোবাইল ফোনে কম করে দু-একবার কথা বলত। ভিত তৈরি থেকে কারখানা ক্রমশ কতটা করে মাথা তুলছে, তার দৈনন্দিন রিপোর্ট দিয়ে যেত। বিশদভাবে। এই সময়টা উদ্দীপনায় টগবগ করে ফুটছিল রজতাভ।

ব্যাঙ্ক কারখানা টারখানার ব্যাপারে টাকা দেয় ঠিকই, তবে সেই টাকাটা ক্লায়েন্ট ঠিকমতো খরচ করছে কিনা, শর্ত অনুযায়ী কাজ এগুচ্ছে কিনা, তার ওপর নজরদারি করার জন্য নিয়মিত লোক পাঠায়। সুজাতাদের ব্যাঙ্কও পাঠাত। তবে নিজে কখনও যায়নি সুজাতা।

মাস আটেকের ভেতর ফ্যাক্টরির শেড, এবং ছোট একটা অফিস বিল্ডিং তৈরি হয়ে গেল রজতাভদের। মেশিন টেশিন বসাতে আরও মাস দুই। এর মধ্যে কিছু কিছু রিক্রুটমেন্টও হয়ে গেছে।

রজতাভ সংস্কারমুক্ত মানুষ। দিনক্ষণ মানে না। তার কাছে সব দিনই ভালো দিন। কিন্তু তার মা চারুলতা সেকেলে মানুষ। পাঁজিপুথির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। তিনি পুরুত ডেকে, তাকে দিয়ে পাঁজি থেকে শুভদিন এবং শুভ মুহূর্ত ঠিক করে নিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী কারখানার উদ্বোধন হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতি করবেন স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিস ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী। প্রধান অতিথি : স্থানীয় বিধায়ক। এ-ছাড়া আমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন বেশ ক'জন সরকারি আমলা, এলাকার বিশিষ্ট কিছু প্রভাবশালী মানুষ। সুজাতাদের ব্যাঙ্কের সবাইকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। রজতাভ নিজে গিয়েছিল সেখানে।

আলাদাভাবে সুজাতাকে বলে এসেছিল, 'আগে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছি। কিন্তু ইন-অগারেশনের দিন যেতেই হবে। কোনও অজুহাত শুনব না।'

হেসে রাজি হয়েছে সুজাতা, 'যাব।'

গিয়েও ছিল সে। ফ্যাক্টরি কমপাউন্ডের ভেতর চমৎকার প্যান্ডেল খাটিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। এ-ধরনের অনুষ্ঠানে যেমনটা হয়, অবিকল সেই ফরমুলা। উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে শুরু। তারপর মন্ত্রী বিধায়ক এবং পদস্থ আমলাদের যান্ত্রিক বক্তৃতা। অঞ্চলের বিশিষ্ট মানুষদের শুভেচ্ছা জানানো। কেন এই কারখানা, সে-সম্পর্কে রজতাভর বক্তব্য পেশ। সব শেষে অতিথি আপ্যায়নের এলাহি বন্দোবস্ত।

অনুষ্ঠানে মাকেও নিয়ে এসেছিল রজতাভ এবং সুজাতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

চারুলতার বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। এই বয়সেও শরীরের বাঁধুনি অনেকটাই অটুট। চুল বেশির ভাগই কালো। ভরাট মুখে, বড় বড় টানা চোখে, প্রতিমার আদল। গলার স্বর ভারি মিষ্টি। মনে হয়, কোনও কিশোরী কথা বলছে। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, মানুষটি খুবই স্নেহপ্রবণ।

সুজাতার মনে পড়ে, রজতাভ পরিচয় করিয়ে দেবার পর সে ঝুঁকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল কিন্তু পা ছোঁবার আগেই তার হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিলেন চারুলতা। বলেছেন, 'রাজুর কাছে সবসময় তোমার কথা শুনি। তোমার সাহায্য ছাড়া এই কারখানা কোনওভাবেই সম্ভব হত না।'

সুজাতা বুঝতে পারছিল, রজতাভর ডাকনাম রাজু। চারুলতা যেভাবে বলেছিলেন তাতে বিব্রত বোধ করেছে সুজাতা। —'সাহায্য করাই তো আমার কাজ। ব্যাঙ্ক এই জন্যেই আমাকে মাইনে দেয়—'

চারুলতা বলেছিলেন, 'কাজ তো অনেকেরই অনেক কিছু থাকে। কিন্তু ঠিক সময়ে কেউ সেটা করে কি? রাজু বলেছে, অন্য কারও কাছে গেলে ওকে বছরখানেক ঘোরাত।'

লোন পাবার পর এই ধরনের কথাই সুজাতাকে বলেছিল রজতাভ। ছেলের কাছে শুনে শুনে এই ধারণাটাই ভদ্রমহিলার মাথায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে। যতই সে 'না, না' করুক, তিনি শুনবেন না। তবু সে বলেছে, 'ব্যাঙ্কের সব এমপ্লয়ীই ক্লায়েন্টকে ঘোরায় না। প্রচুর কাজের লোকও আছে। তা ছাড়া রজতাভর কাগজপত্রে কোনও গোলমাল নেই। আমি না হয়ে অন্য কেউ হলেও লোন ঠিক সময়ে বেরিয়ে যেত।'

চারুলতা সুজাতার কথা মেনে নিলেন কিনা বোঝা যায় নি। তিনি এবার বলেছেন, 'কারখানাটা ছিল ওর স্বপ্ন। এর জন্য আমরা তোমার কাছে যে কতখানি কৃতজ্ঞ বলে বোঝাতে পারব না।'

সঙ্কোচে দু'হাত নেড়ে সুজাতা বলেছে, 'এভাবে বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।'

কয়েক পলক সুজাতার দিকে তাকিয়ে থেকেছেন চারুলতা। তারপর বলেছেন, 'ঠিক আছে, ও নিয়ে আর কিছু বলছি না। তবে—'

'তবে কী?'

'অন্য একটা কথা কিন্তু বলতেই হবে।'

চারুলতা কী বলতে চাইছেন, বোঝা যাচ্ছিল না। উৎসুক ভাবে তাঁকে লক্ষ করতে করতে সুজাতা বলেছে, 'বেশ তো, বলুন না—'

'তুমি আমাকে একটা ব্যাপারে খুব দুঃখ দিয়েছ।'

সুজাতা হকচকিয়ে গেছে।— 'আমি!'

চারুলতা আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন।—'হ্যাঁ। তোমাকে দেখার জন্যে কী ইচ্ছে যে করত! রাজুকে দিয়ে কত বার খবর পাঠিয়েছি, তুমি কিন্তু আমাদের বাড়ি যাওনি।'

ব্যাঙ্ক লোনের জন্য যে অ্যাপ্লাই করেছে তার বাড়িতে যাওয়া কী কারণে সম্ভব ছিল না সেটা আর বৃদ্ধাকে জানায় নি সুজাতা। সে শুধু বলেছে, 'নানা কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে যাওয়া হয়নি।'

'আমি কিন্তু আশা করে আছি, তুমি ঠিক একদিন যাবে।'

সুজাতা একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য চারুলতার আগ্রহটা রীতিমতো বেশি বেশিই মনে হয়েছে। কী আছে এর পেছনে? ছেলেকে সে লোন পাইয়ে দিয়েছে, সেজন্য বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে আরও ঘটা করে কি ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান? নাকি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্য কিছু? ধন্দে পড়ে গিয়েছিল সুজাতা। এমনিতে কারও বাড়ি যাওয়া খুব একটা পছন্দ করে না সে, কিন্তু চারুলতার ব্যগ্রতা এতটাই যে মুখের ওপর 'না' বলা যায়নি।

কারখানার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাসখানেক বাদে মাত্র একবারই রজতাভদের বাড়ি গেছে সুজাতা। রজতাভই তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

টালিগঞ্জের নিরিবিলি পাড়ায় রজতাভদের ছিমছাম, ছোট্ট, দোতলা বাড়ি। চারপাশে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। সামনের দিকে বাগান, পেছনে গ্যারাজ, দু'ধারে উঁচু উঁচু গাছ। দেবদারু কৃষ্ণচূড়া আম কালোজাম—এই সব।

বাড়িটার গোলাপি রং, মার্বেল-বসানো ফ্লোর, দরজা জানালার পর্দা, আসবাব—সমস্ত কিছুতেই রয়েছে সুরুচির ছাপ।

সুজাতা যাওয়ায় চারুলতার চোখমুখ থেকে খুশি উপচে পড়েছিল। তাকে নিয়ে কী করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তার একটা হাত ধরে দোতলার ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে পুরু গদিওলা সোফায় বসিয়ে দিয়েছেন। রজতাভও কাছাকাছি অন্য একটা সোফায় বসেছিল।

সুজাতার আসার খবরটা আগে থেকেই জানা ছিল। তাই নিজের হাতে কত রকমের খাবার যে করেছিলেন! সেটা শীতকাল। পিঠের মরশুম। পাটিসাপটা সিদ্ধপুলি দুধপুলি পায়েস—এসব তো ছিলই। তা ছাড়া মাছের চপ হিংয়ের কচুরি চিংড়ির কাটলেট। বড় মিষ্টির দোকান থেকে জলভরা নলেন গুড়ের সন্দেশ আর রসমালাই।

সুখাদ্যগুলি যত্ন করে সুজাতার সামনে সাজিয়ে দিয়ে তার পাশে বসেছিলেন চারুলতা। স্নিগ্ধ সুরে বলেছেন, 'খাও মা—'

সুজাতা আঁতকে উঠেছে।—'এ কী করেছেন মাসিমা! এত খাবার আমি এক মাসেও খেতে পারব না।'

'আচ্ছা আচ্ছা। যা পার খাও—'

'আপনি আমাকে একটা খালি প্লেট আর চামচ দিন।'

ডায়েটিং টয়েটিং না করলেও এমনিতে সুজাতা বেশ স্বল্পাহারী। গাদা গাদা খেয়ে মুটিয়ে যেতে সে মোটেও রাজি নয়। ফাঁকা প্লেট এলে পছন্দমতো খাবার তুলে নিয়েছিল। রজতাভকে বলেছিল, 'আমি একাই খাব নাকি? তুমিও নাও—'

রজতাভ লঘু সুরে বলেছে, 'আমার জন্যে আছে। পরে খাব।'

'পরে আবার খেও। এখন আমাকে একটু কোম্পানি দাও—'

অগত্যা একটা প্লেট এনে রজতাভও কচুরি টচুরি তুলে নিয়েছে।

খেতে খেতে নানা গল্প হচ্ছিল। বেশি কথা বলছিলেন চারুলতাই। শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ। সুজাতা সম্পর্কে তাঁর অপার কৌতূহল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার মা বাবা দাদা-বৌদিদের সম্পর্কে জেনে নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কে কী ধরনের কাজ করতে হয়, ডিউটি আওয়ার্স কখন শুরু, কখন শেষ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ি বা সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে প্রথম দিকে কিছুই জানতে চাননি। সুজাতা বেশ অবাকই হয়ে গিয়েছিল।

চারুলতা কথা বলছিলেন ঠিকই, তবে তাঁর নজর ছিল সুজাতার খাওয়ার দিকে। মাঝে মাঝেই একরকম জোর করে এটা সেটা তার প্লেটে তুলে দিচ্ছিলেন। 'আমি তো নিয়েছিই। আর দেবেন না মাসিমা। অত খেলে ভীষণ কষ্ট হবে।' কিন্তু তার কোনও আপত্তিই কানে তোলেননি চারুলতা।

ঘণ্টাদেড়েক রজতাভদের বাড়িতে কাটাবার পর সুজাতা যখন বিদায় নেবার কথা ভাবছে সেই সময় আচমকা চারুলতা বিষাদের সুরে বলেছিলেন, 'রাজুর কাছে তোমার জীবনের একটা ভীষণ দুঃখের কথা শুনেছি। এত অল্প বয়েস, এর মধ্যেই সাধ-আহ্লাদ সুখ, সব শেষ হয়ে গেছে।'

চকিতে অঞ্জনের মুখ মনে পড়ে গিয়েছিল সুজাতার। বুকের ভেতরটা উতরোল হয়ে উঠেছে। সে উত্তর দেয়নি।

চারুলতা থামেননি। পুরনো আমলের মানুষেরা যেমনটা বলেন, তিনিও তাই বলেছিলেন, 'সমস্তই ভাগ্য। ঈশ্বরের এই রকমই ইচ্ছা ছিল। কারও কিছু করণীয় নেই।'

এই একটা ব্যাপার, বেশির ভাগ বয়স্ক লোকজন জাগতিক সব কিছু—জন্ম-মৃত্যু, স্বজন হারানোর শোক—ঈশ্বর এবং ভবিতব্যের ওপর সমর্পণ করে বসে আছেন। কে জানে, হয়তো চারুলতাই ঠিক। এমন কথা আগে আরও অনেকে বলেছে। ঈশ্বরের কাঁধে দায়টা চাপিয়ে দিলে অবশ্য খানিকটা হালকা হওয়া যায়।

চারুলতা এবার জানিয়েছেন, 'ভগবান এক হাতে শোক যেমন দেন তেমনি আরেক হাতে কষ্টের লাঘবও করেন। নইলে মানুষ কি বেঁচে থাকত!'

সুজাতা চুপ করে থেকেছে। এ-জাতীয় সান্ত্বনা বাক্য নতুন কিছু নয়।

চারুলতা কিছু চিন্তা করে বলেছেন, 'তোমার দাদা তো বিদেশে থাকেন। রাজুর কাছে শুনেছি, তিনি তোমাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চান।'

সুজাতা বলেছে, 'হ্যাঁ। খুবই তাড়া দিচ্ছে। যাইনি বলে ভীষণ রেগে গেছে।'

'শেষ পর্যন্ত কি যাবে?'

'এখনও তেমন কিছু ভাবিনি।'

একটু নীরবতা।

তারপর চারুলতা বলেছেন, 'তোমার বাকি জীবন—' শেষ না করেই তিনি থেমে গেছেন।

সুজাতা জিগ্যেস করেছে, 'বাকি জীবন কী?'

'না, থাক—' আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন চারুলতা।

কিছুক্ষণ স্থির চোখে চারুলতার দিকে তাকিয়ে থেকেছে সুজাতা। তিনি কী বলতে চাইছিলেন সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করে নি।

সেই যে সুজাতা চারুলতার সঙ্গে দেখা করে এসেছে তারপর মাস দুই তিন কেটে গেছে। এর মধ্যে রজতাভর ফ্যাক্টরি চালু করার তোড়জোড় চলছে পুরোদমে। তার ব্যস্ততা বেড়েছে শতগুণ। তবু সময় করে সপ্তাহে দু-তিন দিন সে সুজাতার ব্যাঙ্কে দুমদাম এসে হাজির হত। আসত হয় লাঞ্চ টাইমে, নইলে ছুটির সময়।

সুজাতা ভুরু কুঁচকে মজার গলায় বলত, 'লোনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন তো তোমার ব্যাঙ্কে আসার কথা নয়। যখন লোন শোধ করার সময় হবে তখন আসবে। ফ্যাক্টরি ফেলে আসাটা ঠিক হচ্ছে না।'

রজতাভ দারুণ সপ্রতিভ। ওজর তার তৈরিই থাকত। বলত, 'ফ্যাক্টরিরই কাজে এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম, আসাই যখন হয়েছে, একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'আই সী।'

একরকম জোর করেই সুজাতাকে কোনও দামি রেস্তোরাঁয় ধরে নিয়ে যেত। সেখানে কফি টফি খেতে খেতে কারখানার কাজকর্ম কীরকম চলছে, কবে থেকে উৎপাদন শুরু হবে, তাদের প্রোডাক্ট মার্কেটিং করার জন্য কী ধরনের ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছে — তড়বড় করে সব বলে যেত।

এইভাবে কিছুদিন চলল। তারপর খুব অল্প সময়ে রজতাভর ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশন শুরু হয়ে গেল। বাজারে মাল ছাড়ার পর রেসপন্স বেশ ভালো। যা লক্ষণ, খুব শিগ্গিরই চাহিদা বেড়ে যাবে। এতটা রজতাভ আশা করে নি। উৎসাহে সে টগবগ করছিল।

যেদিন রজতাভ প্রথম ব্যাঙ্কে আসে, তার সঙ্গে কথা বলে ভালো লেগেছিল সুজাতার। এই কাজপাগল স্বপ্নদর্শী যুবকটাকে যত দেখছিল ততই মুগ্ধ হচ্ছিল সে। কোনও রকম মালিন্য নেই, অসভ্যতা নেই। পা থেকে মাথার চুল অব্দি একটি ভদ্র, পরিচ্ছন্ন মানুষ।

কারখানা চালু হবার পর এই যে সপ্তাহে বার দুই-তিন রজতাভ ব্যাঙ্কে হানা দিত, সেজন্য একটু খোঁচা দিলেও ক্রমশ সুজাতা টের পাচ্ছিল তার বুকের ভেতর কোনও বন্ধ দরজা খুলে একটা গোপন ইচ্ছা বেরিয়ে আসছে। এই যে সপ্তাহে দু-তিন দিন আসে রজতাভ সেজন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকে। কাজের চাপে এক সপ্তাহ না এলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

মনে আছে, ব্যাঙ্কেই দেখা করত রজতাভ। কিন্তু একদিন রাত্রিবেলা সুজাতা খাওয়াদাওয়ার পর ঢোলা নাইটি পরে শোবার জন্য তৈরি হচ্ছে। হঠাৎ মোবাইল ফোন বেজে উঠেছিল। তার বিশেষ কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। অবশ্য ব্যাঙ্কের বড় বড় কিছু ক্লায়েন্ট আছে। তাঁরা মাঝে মধ্যে খুব জরুরি কোনও ব্যাপার থাকলে হয় সকালের দিকে, নাইলে সন্ধে সাতটা সাড়ে-সাতটার মধ্যে ফোন করেন। কোনও মহিলাকে বেশি রাত্তিরে ফোন করাটা শোভন নয়। সবাই শালীনতা বজায় রেখে চলেন।

সুজাতা রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিল। ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই রজতাভর গলা ভেসে এসেছে। 'দারুণ একখানা চমক দিয়েছি তো? নিশ্চয়ই এই সময় আমাকে এক্সপেক্ট করো নি?'

বিস্ময়টা থিতিয়ে যেতে খানিকটা সময় লেগেছে সুজাতার। তারপর সে বলেছে, 'সত্যিই করি নি। তা হঠাৎ ফোন করলে যে? এনিথিং আর্জেন্ট?'

'অফ কোর্স।'

কোনও সমস্যায় পড়েছে কি রজতাভ? কোনও বিপদে? চিন্তাগ্রস্তের মতো সুজাতা জিগ্যেস করেছিল, 'কী হয়েছে?'

রজতাভ বলেছে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলব, সেটা কি আর্জেন্ট ব্যাপার নয়?'

রজতাভর উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সে তার সঙ্গে খানিকটা সময় গল্প টল্প করে কাটাতে চায়। সুজাতার যে খারাপ লেগেছিল তা নয়। তবু বলেছে, 'বুঝলাম। কিন্তু আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। এখন ছাড়ছি। কাল সন্ধেবেলায় ফোন কোরো—'

রজতাভ ব্যস্তভাবে বলেছে, 'প্লিজ প্লিজ, ছেড়ো না। আসলে ব্যাপারটা কী জানো?'

'কী?'

'রোজ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ফ্যাক্টরির কাজকর্ম ফেলে তোমার ব্যাঙ্কে যাওয়া তো সম্ভব নয়। তাই ঠিক করেছি এখন থেকে প্রত্যেক দিন রাত্তিরে তোমাকে ফোন করব। কী, আপত্তি নেই তো?'

হালকা গলায় সুজাতা বলেছে, 'তুমি যা ছেলে, আপত্তি করে কিছু হবে?'

শব্দ করে হেসে উঠেছিল রজতাভ। — 'যাক, আমার টাইপটা তা হলে বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি। একগুঁয়ে, জেদি, অবস্টিনেট—'

সপ্তাহে দু-তিনদিন দেখা আর রোজ রাত্তিরে কুড়ি পঁচিশ মিনিট ফোন। এইভাবে চলল মাসের পর মাস।

তারপর কাল বিকেলে ব্যাঙ্কে ফোন করে রজতাভ জানিয়ে দিয়েছিল, আজ লাঞ্চ খেতে খেতে সে তার জীবনের সব চেয়ে জরুরি কথাটা বলবে। . . . .

কতক্ষণ অন্যমনস্কর মতো বসে ছিল, খেয়াল নেই সুজাতার। 'আ গিয়া মেমসাব—' উর্দি-পরা শোফারের গলা কানে আসতে চমকে ওঠে সে। দেখল, ক্যামাক স্ট্রিটে তাদের অফিসের সামনে গাড়িটা পৌঁছে গেছে।

চার

যত দিন যাচ্ছে, ব্যাঙ্কের কাজের চাপও ততই বেড়ে চলেছে। বিজনেস লোন, হাউস বিল্ডিং লোন, ক্রেডিট কার্ড — এমনি নানা ঝক্কি সুজাতাকে সামলাতে হয়। আজকাল সরকারি বেসরকারি সব অফিসের একটাই মূলমন্ত্র। কম লোক দিয়ে বেশি বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া।

অফিসে এলে নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না সুজাতার। অনেকগুলো লোন অ্যাপ্লিকেশনের ফাইল জমে আছে, সেগুলো প্রসেস করে ম্যানেজারের বিবেচনার জন্য পাঠানো দরকার। ক্লায়েন্টরা যে-সব ডকুমেন্ট জমা দিয়েছে তার খুঁটিনাটি তন্ন তন্ন করে দেখতে হলে ফাইলে বা কম্পিউটারে ডুবে যেতে হয়। কিন্তু আজ হাজার চেষ্টা করেও মন বসাতে পারছে না সুজাতা। কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ঘড়ির কাঁটা সময় মাপতে মাপতে যত এগিয়ে চলেছে, আনমনা ভাবটা ততই বেড়ে চলেছে সুজাতার। কাল থেকেই স্নায়ুমন্ডলীতে এক ধরনের উত্তেজনা টের পাওয়া যাচ্ছিল; সেটাও ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

লাঞ্চ ব্রেকের সময় সুজাতা লক্ষ করল যে-ফাইলটা সে খুলে বসেছিল তার দশটা শব্দও তার পড়া হয় নি। নাঃ, আজ কিছু হবার নয়।

ফাইল বন্ধ করে নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুজাতা। অফিসের গাড়িতে পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল।

যে বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় লাঞ্চের জন্য টেবল 'বুক' করা হয়েছে সেটার সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল রজতাভ। বোঝাই যায়, সুজাতার জন্য সে অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে পড়েছে।

গাড়ি থেকে সুজাতা নামতেই রজতাভ ছুটে এল। সুজাতা জিগ্যেস করে, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

রজতাভ সারা মুখ জুড়ে হাসে।— 'টেনশনে।'

'কিসের টেনশন?'

'লাস্ট মোমেন্টে মাইন্ড চেঞ্জ করে যদি না আসো—'

সুজাতা আড়াই বছরের মতো রজতাভকে দেখছে। এতদিনে সে জেনে গেছে ওর মধ্যে এক ধরনের ছেলেমানুষী অধীরতা রয়েছে। বলল, 'আমি কথা দিলে কথা রাখি।'

'ফাইন—' রজতাভ উচ্ছ্বাসের সুরে বলে, 'ভবিষ্যতেও রেখো কিন্তু —'

ভবিষ্যতে কোন কথা তাকে রাখতে হবে, আন্দাজ করতে চেষ্টা করল সুজাতা। আবছাভাবে কিছু একটা মনে হল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করল না। শুধু বলল, 'রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি?'

শশব্যস্ত রজতাভ বলল, 'না না, চল—'

সুজাতাকে নামিয়ে দিয়ে শোফার অর্থাৎ বিকাশ গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বিদায় করে সুজাতা রজতাভর সঙ্গে এগিয়ে যায়। আগেই সে ঠিক করে রেখেছিল, লাঞ্চের পর ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে।

এই অভিজাত রেস্তোরাঁয় আগেও অনেকবার এসেছে সুজাতা। এখানকার সমস্ত কিছুই তার চেনা।

রেস্তোরাঁটা দোতলা। গ্রাউন্ডে ফ্লোর থেকে একটা সুদৃশ্য ঘোরানো সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। এই লাঞ্চ টাইমে প্রায় সব টেবলই বোঝাই। যা দু-চারটে ফাঁকা রয়েছে সেগুলো 'রিজার্ভড'। পরে লোক এসে যাবে।

মৃদু আলো-আঁধারিতে চারদিকে আশ্চর্য এক মায়াবী পরিবেশ। খুব হালকা সুরে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ক্যাসেট বেজে চলেছে।

নানা টেবলের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে দু'জনে দোতলায় উঠে গেল।

রজতাভ এমন জায়গায় টেবল 'বুক' করেছে যার গা ঘেঁষে রয়েছে একটা মোজেক-করা গোল পিলার। ওটা থাকায় চারপাশের ভিড়ের ভেতর একটু আড়াল পাওয়া গেছে। তারা কথা বললে কেউ শুনতে পাবে না। অবশ্য এখানে যারা খেতে আসে, অন্যের ব্যাপারে তাদের কৌতূহল নেই।

ওরা বসতে না বসতেই স্টুয়ার্ড এসে হাজির। তাকে খাবারের অর্ডার দিয়ে কিছুক্ষণ তার কারখানা, প্রোডাকশন ইত্যাদি নিয়ে বকে গেল রজতাভ। খুবই মামুলি কথাবার্তা। এমনটা সে রোজই বলে।

সুজাতা বুঝতে পারছিল, জমি তৈরি করে নিচ্ছে রজতাভ। ঝুলি থেকে বেড়ালটা কখন বেরোয় সেটাই শুধু দেখার।

খাবার এসে গেল। খানিকটা খাওয়ার পর রজতাভ আসল প্রসঙ্গে চলে আসে। 'এভাবে আর চলতে পারে না।'

ভুরু সামান্য উঁচুতে তুলে সুজাতা বলে, 'কীভাবে?'

রজতাভ বলতে লাগল, 'উইকে দু-তিন দেখা আর রাত্তিরে ফোন — এমন করে লাইফ কাটানো সিম্পলি ইমপসিবল।'

সুজাতা অস্পষ্টভাবে কী বলল, তার একটি শব্দও বোঝা গেল না।

রজতাভ গভীর গলায় বলল, 'তোমাকে ছাড়া আমার লাইফটা ইনকমপ্লিট মনে হচ্ছে। অনেক ভেবে দেখেছি, আমাদের একটা ডিশিসন নিতে হবে। আমার দিক থেকে নিয়েও ফেলেছি। আশা করি সিদ্ধান্তটা কী, তুমি তা জানো।' একটু থেমে ফের বলল, 'আমার বিশ্বাস, তুমিও একই ডিশিসন নিয়েছ।'

মুখ নামিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকে সুজাতা। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, তার ভেতরটা কতখানি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। উৎকণ্ঠিত রজতাভ টেবলের ওধার থেকে তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

কালই এমনটা আঁচ করে নিয়েছিল সুজাতা। ভেতরকার ঝড় থামলে মুখ তুলে সে বলে, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও—'

'আমাকে মুখ ফুটে না বললেও, ধরে নিতে পারি, ওটা নিয়ে তুমি এতদিন কম ভাবো নি। তোমার দ্বিধাটা কোথায়, আমি জানি। বুঝতে পারি।'

সুজাতা চুপ।

রজতাভ টেবলের ওপর দিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে বলল, 'তোমার জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে সেটা খুবই দুঃখের, তার শক কাটিয়ে ওঠা মুশকিল। কিন্তু—'

সুজাতার খাওয়া থেমে গিয়েছিল। সে একেবারে চুপ। শুধু তার হাতের চামচটা প্লেটের খাদ্যবস্তুগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল।

রজতাভ বলেই যাচ্ছিল। 'মানুষ শুধু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। পিছুটানেই যদি থমকে যায়, আটকে পড়ে, সামনের দিকে এগুবে কী করে?' বলতে বলতে হঠাৎ তার খেয়াল হল, সুজাতা খাচ্ছে না। তাড়া দিয়ে বলল, 'কী হল— খাও।'

'হ্যাঁ, খাচ্ছি—' অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুজাতা। আস্তে আস্তে চামচে করে প্লেট থেকে বাটার-ভেটকির একটা টুকরো কেটে তুলে নিল।

রজতাভ গভীর গলায় বলে, 'তোমার কাছে যেটুকু শুনেছি তাতে মনে

হয়েছে, অঞ্জন চমৎকার মানুষ। সে যদি একটা স্কাউন্ড্রেল হত, পাজির পা ঝাড়া হত, তাকে ভুলে যেতে দশ দিনও লাগত না। সে এত ভালো বলেই তোমার মধ্যে বাধা তৈরি হয়ে আছে।' একটু থেমে বলল, 'বাধাটা কাটিয়ে উঠতে আমি সাহায্য করব।'

কোন পদ্ধতিতে বাধা কাটাবে তা জানতে চাইল না সুজাতা।

লাঞ্চ শেষ হতে ঘন্টা দুই লাগল। তারপর বিল মিটিয়ে রেস্তোরাঁর বাইরে এল ওরা। সুজাতা বলল, 'আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দাও—'

রজতাভ জিগ্যেস করে, 'ট্যাক্সি দিয়ে কী হবে?'

'লাঞ্চ খাওয়ালে, তোমার জরুরি কথা শুনলাম। এখন বাড়ি ফিরতে হবে না?'

'নো—নো—নো—'

'নো মানে?'

রজতাভর নিজস্ব একটা মারুতি এইট হানড্রেড গাড়ি আছে। সেটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে পার্ক করা ছিল। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'এস আমার সঙ্গে। গাড়িটায় ওঠ।'

সুজাতা হকচকিয়ে যায়। — 'না না, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না।' তার মাথায় লহমায় একটা প্রবল অস্বস্তি ঢুকে গেছে। 'দত্ত ম্যানসন'-এর সামনে একজন অপরিচিত যুবকের গাড়ি থেকে তাকে নামতে দেখলে ও-বাড়ির লোকেরা কী ভাববে?

রজতাভ খুব সম্ভব তুখোড় থট-রিডার। সুজাতার মনোভাব চকিতে আঁচ করে নেয়। বলে, 'তুমি বিব্রত হবে, এমন কিছু কি আমি করতে পারি? তোমাকে তোমার শ্বশুরবাড়ি অব্দি নিয়ে যাব না।'

'তা হলে?'

'আমরা এখন ভবানীপুরে যাব। সেখানে একটা কাজ সেরে তোমাকে ট্যাক্সি ধরে দেব। তুমি বাড়ি ফিরে যেও। আমি সেকেন্ড হাওড়া ব্রিজ ধরে ফ্যাক্টরিতে চলে যাব।'

সুজাতা অবাক। বলল, 'ভবানীপুরে নিয়ে যাবে কেন?'

'সেখানেই গেলেই বুঝতে পারবে।'

'কী আশ্চর্য, আমি —'

কথাটা শেষ করা গেল না। নিজের ঠোঁটে তর্জনী রেখে সুজাতাকে থামিয়ে দিয়ে রজতাভ বলল, 'লাইক আ গুড গার্ল চটপট গাড়িতে উঠে পড়—'

সুজাতার কী যে হয়ে গেল, আর কোনও প্রশ্ন করল না। এই যুবকটির মধ্যে এমন অনেক ব্যাপার আছে — ছেলেমানুষি, সারল্য, জেদ, কর্তৃত্ব, নাকি তার ওপর অধিকার বোধ — যে সে জোর দিয়ে কিছু বললে সুজাতার পক্ষে 'না' বলা সম্ভব নয়।

পাঁচ

পার্ক স্ট্রিট থেকে ভবানীপুরে পৌঁছুতে মিনিট কুড়ি লাগল। জগুবাবুর বাজারের উলটো দিকের একটা রাস্তায় ঢুকে একটা সেকেলে দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামায় রজতাভ। রাস্তার ওপরেই সদর দরজা। সেটার মাথায় সাইন বোর্ড : ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস। তার নিচে লেখা : রামশঙ্কর ভট্টাচার্য এম.এ., বি.এল।

হাড়েমজ্জায় হিম বয়ে যায় সুজাতার। গলার স্বর বুজে আসছিল। কোনও রকমে সে বলতে পারে, 'এখানে নিয়ে এলে কেন?'

'পরে বলছি—' বাইরের দরজার পাশের দেওয়ালে কলিং বেলের সুইচ। রজতাভ সেটা টেপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাঝবয়সী একটি কাজের লোক দরজা খুলে দিল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করল, 'ক'দিন আগে আপনি এসেছিলেন না বাবু?'

'হ্যাঁ। রামশঙ্করবাবু বাড়ি আছেন?'

'আছেন।'

নিজের নামটা জানিয়ে রজতাভ বলল, 'আমার কথা গিয়ে বল। আজ এই সময় উনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।'

লোকটা বলল, 'আপনারা ভেতরে এসে বসুন। আমি বড়বাবুকে খবর দিচ্চি।'

সদর দরজা থেকে একটা চওড়া প্যাসেজ বাড়ির ভেতর দিকে চলে গেছে। প্যাসেজটা যেখানে শুরু তার ঠিক ডান ধারের একটা ঘর খুলে দিল আধবুড়ো লোকটা। ঘরটা পুরনো আমলের মস্ত টেবল আর গদিওলা বেশ ক'টা চেয়ার দিয়ে সাজানো। সিলিং থেকে ফ্যান ঝুলছে। দুই দেওয়াল জুড়ে আলমারি বোঝাই আইনের বই। সুজাতা আর রজতাভকে সেখানে বসিয়ে লোকটা চলে গেল।

রজতাভ জানালো, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য আলিপুর কোর্টের বাঘা ল'ইয়ার ছিলেন। দু'টো স্ট্রোক হবার পর ওকালতি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতেই থাকেন। ধর্মচর্চা আর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের কাজ করে তাঁর সময় কাটে। মানুষটি চমৎকার।

রামশঙ্করের জীবনেতিহাস সম্পর্কে লেশমাত্র আগ্রহ নেই সুজাতার। কাজের লোকটাকে রজতাভ যা সব বলছিল তা থেকে এটা পরিস্কার, হুট করে আজ এখানে আসে নি সে। রীতিমতো আটঘাট বেঁধে, ছক কষে, সে তাকে নিয়ে এসেছে। অথচ এখানে আসার ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও আগে জানায়নি।

ভীষণ উতলা লাগছিল। টেনশনে গলা শুকিয়ে আসছে সুজাতার। উদ্বেগের সুরে বলল, 'এর মানে কী?'

'কিসের?'

'বললে না তো এখানে কেন নিয়ে এসেছ?'

নিস্পাপ মুখ করে রজতাভ বলে, 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে মানুষ কী করতে আসে? সাপ লুডো খেলতে?'

নিজের ব্যক্তিত্বের খানিকটা ফিরে আসে সুজাতার মধ্যে। চাপা, তীব্র গলায় সে বলে, 'তুমি কি আজই বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইছ? জানো, এসবের জন্য মেন্টাল প্রিপারেশন দরকার। অঞ্জন নেই, কিন্তু তাদের বাড়িতে আমি থাকি। ওর মা বাবা কাকিমা ভাই বোনদের জানাতে হবে। আমার দাদা-বৌদি আমেরিকায় থাকে। তাদের খবর দিতে হবে। আমরা কি টিন-এজার? দুম করে এরকম একটা কান্ড ঘটিয়ে ফেললেই হল! লাইফটা হুইমজিক্যালি চলার ব্যাপার নয়। কী করে—'

'প্লিজ প্লিজ প্লিজ—' অনেক কষ্টে, প্রায় হাতজোড় করে সুজাতাকে থামাল রজতাভ, 'কুল ডাউন, কুল ডাউন। আমার কথাটা আগে শোন—'

রাগ, উত্তেজনা পুরোপুরি কাটে নি। বিরক্ত, অসহিষ্ণু সুরে সুজাতা বলে, 'কী শুনব?'

'আমারও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের না জানিয়ে বিয়েটা হওয়া কি সম্ভব?'

'তা হলে এখানে কী করতে এসেছ?'

'একমাসের নোটিশ দিতে।'

'এত আগে থাকতে—' কথাটা শেষ করতে পারল না সুজাতা।

রজতাভ হাসল।— 'মেন্টাল প্রিপারেশনের জন্যে সময় তো দরকার। এর মধ্যে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারবে। দাদা, বৌদি, অঞ্জনদের বাড়ির লোকজন, ফ্রেন্ডস, কলিগস, সবাইকে জানাতে পারবে। তা ছাড়া —'

'তা ছাড়া কী?'

'তোমার ওপর একটা প্রেসার থাকবে। ভেতরে ভেতরে যে বাধাটা এখনও রয়েছে সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে প্রেসারটা খুব দরকার।'

উত্তর দেওয়া হল না সুজাতার। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। মাথার চুল ধবধবে। টকটকে রং। সারা মুখ জুড়ে আশ্চর্য এক প্রশান্তি। সৌম্যদর্শন বলতে যা বোঝায় তাই। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা।

পরনে সরু-পাড় ধুতি এবং হাফহাতা পাঞ্জাবি। পায়ে শুঁড়তোলা চটি। পোশাকে আশাকে পুরনো আমলের যে বাঙালিরা প্রায় বিলীন হয়ে গেছে এঁকে দেখলে তাদের কথা মনে পড়ে যায়। নিশ্চয়ই রামশঙ্কর ভট্টাচার্য।

তাঁর চেহারায় এমন এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে রজতাভ উঠে দাঁড়ায়। দেখাদেখি সুজাতাও। 'বসুন-বসুন—' তাদের বসিয়ে নিজেও টেবলের অন্য প্রান্তে বসলেন রামশঙ্কর।

রজতাভ বলল, 'আপনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়। সেদিনও বলে গেছি আপনি করে বললে ভীষণ অস্বস্তি হয়।'

'আচ্ছা, আর বলব না।'

সেই কাজের লোকটি একটা ট্রেতে তিনজনের জন্য চা এবং সুজাতা আর রজতাভের জন্য সন্দেশ দিয়ে গেল।

রজতাভ বিব্রতভাবে বলে, 'আমরা এই একটু আগে লাঞ্চ খেয়ে এসেছি। গলা পর্যন্ত বোঝাই। এখন চা ছাড়া আর কিছু খেতে পারব না।'

রামশঙ্কর জানালেন, বাড়িতে কেউ এলে শুধু চা দেওয়া যায় না। মিষ্টিমুখ করানোটা তাঁদের বংশের বহু কালের রেওয়াজ। রজতাভদের বয়স কম। পরিপাক শক্তি বেশি। দু'টো সন্দেশ খেলে এমন কিছু অসুবিধা হবে না।

রজতাভর মনে পড়ল, আগের দিন এসেও তাকে মিষ্টি খেয়ে যেতে হয়েছে। না, আপত্তি করে লাভ নেই।

রামশঙ্কর একটা চায়ের কাপ তুলে নিয়েছিলেন। হালকা চুমুক দিয়ে সুজাতার দিকে তাকালেন। তাঁর আচরণ, কথা বলার ভঙ্গি, তাকানো — সব বুঝিয়ে দেয়, মানুষটি স্নেহপ্রবণ। স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'রজতাভর কাছে তোমার সব কথা শুনেছি। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ অদৃষ্টবাদী। ভাগ্যে যা লেখা থাকে তা খন্ডানো যায় না। ভবিতব্যকে মেনে নিতেই হয়। তোমার জীবন থেকে যে চলে গেছে সে কোনও দিনই ফিরে আসবে না।'

রামশঙ্কর যে অঞ্জনের কথা বলছেন তা বোঝাই যাচ্ছে। সুজাতা নতমুখে চুপচাপ বসে থাকে।

রামশঙ্কর বলেই চলেছেন, 'একজন নেই বলে আরেকজনের বাকি জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, শূন্য হয়ে যাবে, আমি তা মানি না। আমি বলব, তোমরা, বিশেষ করে তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ।'

সুজাতা চমকে ওঠে। রজতাভর সঙ্গে তার জীবন যে নানা দিক থেকে জড়িয়ে যাচ্ছে তা অনেক আগেই সে টের পেয়েছিল। রামশঙ্কর সিদ্ধান্তের কথা বললেন, কিন্তু সেটা নিতে পারছিল না। মনে মনে তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল শুধু। দু'পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা কি এতই সহজ? কিন্তু রামশঙ্করকে তা জানানো গেল না। মনস্থির না করেই সে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে চলে এসেছে, বললে তিনি বিশ্বাস করবেন কেন?

রামশঙ্কর থামেন নি। — 'তুমি স্বাবলম্বী মেয়ে। আর্থিক দিক থেকে দুশ্চিন্তা নেই। কারও মুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। তবু পুরুষ বা নারীর বিয়েটা খুবই প্রয়োজন। মান সম্মান অর্থ — এ সব যথেষ্ট নয়। বিয়েটা শুধু দেহসর্বস্বও নয়। বয়েস বাড়লে মানুষ বুঝতে পারে একজন কম্পানিয়নের কতটা প্রয়োজন।'

রামশঙ্করের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছিল সুজাতা। শ্রদ্ধাও হচ্ছিল। বয়স্ক মানুষটির মাথায় সেকেলে ধ্যানধারণা থাকলেও তিনি বেশ সংস্কারমুক্ত। যা বললেন তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। সুজাতা এবারও জবাব দেয় না।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর রামশঙ্কর শুরু করলেন, 'আমি এখন পর্যন্ত দু শ' তেত্রিশটা বিয়ে দিয়েছি। প্রত্যেকটা সাকসেসফুল। আশা করি, তোমরাও সুখী হবে।' টেবলের ড্রয়ার থেকে ইংরেজিতে টাইপ-করা একটা কাগজ বার করে রজতাভর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'তোমরা যে নোটিশ দেবে সেটা তৈরি করে রেখেছি। পড়ে সই করে দাও—'

দ্রুত চোখ বুলিয়ে, নিচে সই করে, কাগজটা সুজাতাকে দিল রজতাভ। হঠাৎ মাথার ভেতরটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায় সুজাতার। ভাবনা চিন্তার শক্তিটা কেউ বুঝিবা মুহূর্তে হরণ করে নিয়েছে। নিজের অজান্তেই যেন, কাঁপা কাঁপা হাতে সেও সই করে দেয়।

নোটিশটা রামশঙ্করের কাছে ফেরত চলে গেছে। সেটা ড্রয়ারে রাখতে রাখতে তিনি বললেন, 'এক মাস পর আবার আমাদের দেখা হবে। এর ভেতর যদি কিছু দরকার হয় ফোন কোরো, নইলে চলেও আসতে পার।'

রামশঙ্করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্র সদনের কাছাকাছি এসে সুজাতাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দিল রজতাভ। সুজাতা সোজা নর্থ ক্যালকাটায় চলে যাবে। আর সে যাবে বাঁ পাশে ঘুরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে।

রামশঙ্করের বাড়িতে অনেকটা সময় কেটেছে। এখন বিকেল ফুরিয়ে আসছে। দিনের তাপাঙ্ক ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। রোদের রং বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে। দূরে, ফোর্ট উইলিয়ামের ওপাশে, হাওড়ার দিকটায়, আকাশের ঢালু চাতালে টকটকে লাল সূর্যটা ফ্রিজ শটের মতো আটকে আছে। কতক্ষণ আর? বড় জোর কুড়ি পঁচিশ মিনিট। তারপরেই ওটা আরও নামতে নামতে ডুবে যাবে। ঝপ করে নেমে আসবে সন্ধে।

কলকাতার রাস্তায় চিরকালের সেই সব দৃশ্য। ট্রাম বাস মিনিবাসের স্রোত, ভিড়, তা ছাড়া হাজার রকমের মিহি মোটা কর্কশ তীব্র কান-ফাটানো আওয়াজ।

ট্যাক্সির জানালার ধারে বসে দূরমনস্কর মতো উঁচু উঁচু হাইরাইজ, যানবাহন ইত্যাদি দেখতে দেখতে সুজাতা ভাবছিল। খানিক আগে রামশঙ্করের বাড়িতে যা ঘটে গেল সেটা যেন অলীক স্বপ্নের মতো। অবিশ্বাস্য। অদৃষ্ট বা ভাগ্য বলে কি কিছু আছে? সে ঠিক জানে না। আদৌ যদি থেকে থাকে, তুখোড় জাগলারের মতো তাকে দিয়ে বিয়ের নোটিশে সইটা করিয়ে নিয়েছে। তখন এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যে বলা যায় নি, 'আমাকে একটু সময় দিন।'

আচ্ছন্নের মতো বসে থাকে সুজাতা। তার ইচ্ছাশক্তি চিন্তাশক্তি সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। একসময় 'দত্ত ম্যানসন'-এ পৌঁছে যায় সে।

ছয়

বিশাল লোহার গেটের একটা পাল্লা খোলা ছিল। দারোয়ান বিষুণ সিং একধারে টুলের ওপর বসে আছে। বয়স সত্তর বাহাত্তর। বিহারের ছাপরা জেলায় তার বাপ-দাদারা সারা জীবন কাটিয়ে দিলেও 'দত্ত ম্যানসন'ই বিষুণের ঘরবাড়ি। চল্লিশ বছর সে এখানে কাজ করছে। এ বাড়িতেই স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। বয়সের তুলনায় স্বাস্থ্য এখনও বেশ মজবুত।

সুজাতাকে দেখে উঠে দাঁড়ায় বিষুণ। বলে, 'বৌদিদি, নিজের কামরার যাবার আগে মা'জির কামরায় যাবেন।' বহুকাল কলকাতায় থাকার কারণে সে বাঙালিই

হয়ে গেছে। বাংলাটা ভালোই বলে। অন্য সব কাজের লোকের মতো বিষুণও দত্ত পরিবারেরই একজন।

মা'জি অর্থাৎ স্বর্ণলতা। অন্য দিন অফিস থেকে ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে গা ধুয়ে, পোশাক পালটে, চা'টা খেয়ে একবার শাশুড়ির ঘরে গিয়ে দেখা করে আসে। কিন্তু আজ এত জরুরি তলব কেন? অফিসে বেরুবার সময় তাঁর শরীর খারাপ দেখে গিয়েছিল। অসুস্থতা কি আরও বেড়েছে? খেয়াল হল, আজ তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছিলেন স্বর্ণলতা। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, গেটের ওধারে ফাঁকা জায়গায় একটা টাটা-সুমো দাঁড়িয়ে আছে। ওটা এ-বাড়ির গাড়ি নয়। কে আসতে পারে? ডাক্তার কি? কিন্তু 'দত্ত ম্যানসন'-এর বাঁধা চিকিৎসক হলেন ডাক্তার সোমেশ্বর দাশগুপ্ত। কিন্তু তাঁর একটা সবুজ রঙের অ্যাম্বাসাডর আছে। বিয়ের পর থেকে ওই একই গাড়ি দেখে আসছে সুজাতা। তা হলে? টাটা-সুমোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে সুজাতা জিগ্যেস করে, 'কে এসেছে বিষুণ?'

'ব্যাঙ্কের বাবুরা।'

রীতিমতো অবাকই হল সুজাতা। সে জানে তিন চারটে বড় বড় ব্যাঙ্কে স্বর্ণলতাদের অ্যাকাউন্ট এবং লকার রয়েছে। রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট। লকারে আছে গয়না, নানা কোম্পানির শেয়ার, ইন্সিওরেন্সের পলিসি এবং সরকারি বন্ডের অজস্র কাগজপত্র, বাড়ির দলিল, ইত্যাদি।

নিশানাথ যতদিন সুস্থ ছিলেন, নিজেই ব্যাঙ্কগুলোয় যেতেন। তাঁর স্ট্রোক হবার পর দু'তিন বছর স্বর্ণলতাই যাচ্ছেন। বিষুণ সিংকে সঙ্গে নিয়ে মাসে কম করে তিন চার বার তাঁকে ছুটতে হয়। যে-সব ইনভেস্টমেন্ট করা আছে, প্রতি মাসেই সেগুলোর ইন্টারেস্টের চেক আসে। অসে ডিভিডেন্ড। চেকগুলো জমা দেওয়া, টাকা তোলা, ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর করলে রিনিউ করা, পাশ-বই আপে-টু-ডেট করা—ঝক্কি কি কম?

স্বর্ণলতা নিজেই যখন ব্যাঙ্কে যান, তখন ব্যাঙ্কের লোকদের বাড়িতে আসার কারণ কী? কৌতূহল হচ্ছিল সুজাতার, সেই সঙ্গে একটু উৎকণ্ঠাও। ব্যাঙ্কের হিসেবপত্রে কিছু কি গন্ডগোল হয়েছে? আজকাল জোচ্চুরি ফেরেববাজির কত ঘটনাই না ঘটছে। সই জাল করে লকার থেকে গয়না টয়না চুরি করা হচ্ছে, অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা হচ্ছে টাকা। কিছু মানুষ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বিষুণ সিংকে কোনও প্রশ্ন না করে ত্বরিত পায়ে সুজাতা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। সোজা চলে আসে স্বর্ণলতার ঘরে।

নিশানাথ যথারীতি তাঁর খাটে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। অফিসে বেরুবার সময় স্বর্ণলতাকেও শুয়ে থাকতে দেখেছিল সুজাতা। এখন অবশ্য বসে আছেন।

তবে নির্জীব ভাব ততটা নেই। ভেতরের কষ্ট কিছুটা হলেও খুব সম্ভব কাটিয়ে উঠেছেন।

খাট থেকে খানিক দূরে দু'টো ঢাউস সোফায় একটা বিরাট ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কের একটা বড় ব্রাঞ্চের ম্যানেজার এবং ডেপুটি ম্যানেজারকে বসে থাকতে দেখা গেল। স্বর্ণলতা তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ম্যানেজার এবং ডেপুটি ম্যানেজারকে আগে দু-একবার এ-বাড়িতে দেখেছে সুজাতা। নামও জানে। সুকুমার চাকলাদার আর মৃণাল গুহঠাকুরতা। অল্পস্বল্প আলাপও আছে।

স্বর্ণলতা বললেন, 'এই যে বৌমা, এসে গেছ। সুকুমারবাবু আর মৃণালবাবুকে খবর দিয়েছিলাম। ওঁরা মিনিট পনেরো হল, এসেছেন। ওঁদের জন্যেই তোমাকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছিলাম। বোসো —'

স্বর্ণলতার খাটের একধারে আলগোছে বসে পড়ল সুজাতা। দত্তরা দু-তিন পুরুষ ধরে সুকুমার চাকলাদারদের ব্রাঞ্চের মস্ত ক্লায়েন্ট। তাঁদের কয়েক লক্ষ টাকা সেখানে ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে। এই ব্যাঙ্কে 'দত্ত ম্যানসন'-এর বাসিন্দাদের আলাদা খাতির। যখন যে-ম্যানেজারই বদলি হয়ে আসুন, ডাকলেই বাড়িতে চলে আসেন।

সুজাতা ভেবে পাচ্ছিল না, তার জন্য ব্যাঙ্কের লোকেদের ডাকানো হয়েছে কেন? সে ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের মেয়ে। সহজে অধৈর্য হয়ে পড়ে না। সে জানে, একটু পরেই সব জানা যাবে। জিগ্যেস করল, 'আপনার পেটের ব্যথাটা এখন কেমন আছে?'

স্বর্ণলতা বললেন, 'ডাক্তার এসেছিল, ওষুধ দিয়ে গেছে। অনেকটা ভালো আছি। সেই পুরনো অম্বলের ব্যাপার।' বলতে লাগলেন, 'আমার কথা থাক। মিস্টার চাকলাদার আর মিস্টার গুহঠাকুরতাকে কেন ডেকেছি, সেটা তোমার শোনা দরকার।'

সুজাতার জানা খবরগুলো আরও একবার জানালেন স্বর্ণলতা। মোট চারটে ব্যাঙ্কে তাঁর আর নিশানাথের নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, লকার, ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে। নিশানাথ প্রায় শয্যাশায়ী, কিছুদিন ধরে স্বর্ণলতার শরীরও ভালো যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে নিয়মিত ছোটাছুটি করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। দু'জনেরই বয়স হয়েছে। কবে কী ঘটে যাবে, কেউ কি বলতে পারে! তাই আগে থেকেই পাকা বন্দোবস্ত করে রাখা দরকার। নিশানাথ এবং তিনি ক'দিন ধরে পরামর্শ করে স্থির করেছেন অ্যাকাউন্টগুলোর অর্ধেক তাঁর আর সুজাতার

নামে করা হবে, বাকি অর্ধেক করা হবে নিশানাথ আর সুজাতার নামে। লকার, ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদি সম্পর্কে একই ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। আজ সুকুমার চাকলাদারদের ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা ঠিক করে নেওয়া হবে। দিন দশেকের ভেতর অন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদেরও ডাকা হবে।

সেই ব্যাঙ্কগুলোতেও একইভাবে নিশানাথ এবং স্বর্ণলতা সঙ্গে তার নামটা জোড়া হবে।

চাকলাদার সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি তো নিজেই একটা বড় ব্যাঙ্কের অফিসার। নিয়ম-টিয়ম সবই জানেন। আপনার দু'কপি ফোটো নিয়ে একদিন কষ্ট করে আমাদের ব্যাঙ্কে চলে আসবেন। আমাদের রেকর্ডে আপনার ফোটো আর সিগনেচার থাকা দরকার।'

সুজাতা বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে। স্বর্ণলতা এবং নিশানাথ যে তাকে নিয়ে এইরকম একটা পরিকল্পনা করে রেখেছেন, ঘুণাক্ষরেও আগে জানা যায় নি। এর জন্য আদৌ সে প্রস্তুত ছিল না।

চাকলাদাররা আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, চা খেয়ে, চলে গেলেন। ততক্ষণে চমকটা খানিক সামলে নিয়েছে সুজাতা। বলল, 'মা, এ আপনি কী করতে চলেছেন! ঝোঁকের মাথায় কিছু করবেন না।'

কেউ তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপত্তি করুক বা প্রতিবাদ জানাক, মোটেই তা পছন্দ করেন না স্বর্ণলতা। 'দত্ত ম্যানসন'-এর তিনি ডিক্টেটর। তিনি যা স্থির করবেন সেটাই শেষ কথা, নতনস্তকে সবাইকে সেটা মেনে নিতে হবে।

সুজাতা বেশ ভয়ে ভয়ে শাশুড়ির দিকে তাকায়। এই বুঝি স্বর্ণলতার রক্তচাপ বেড়ে যায়, এই বুঝি তিনি অসহ্য রাগে ফেটে পড়েন। কিন্তু না, মাথাটা আজ তাঁর খুব ঠান্ডা। হিমশীতল। সুজাতা নরম গলায় এবার বলল, 'দেখুন, আপনার ছেলে নেই। আমি—আমি—' বাকিটা আর শেষ করতে পারল না।

স্বর্ণলতা লহমায় তার মনোভাবটা আঁচ করে নেন। বলেন, 'অঞ্জন নেই ঠিকই, কিন্তু তুমি এ-বাড়িরই একজন। যেমন আমি, তোমার শ্বশুর, বিনোদিনী, সোনা, বাবুন। আমাদের সবার মতো 'দত্ত ম্যানসন'-এ তোমারও সমান অধিকার। অনেক ভাবনা-চিন্তা করেই ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা তোমার শ্বশুর আর আমি ঠিক করেছি।'

ঢোক গিলে সুজাতা বলল, 'কিন্তু—'

'কিসের কিন্তু—' কপাল সামান্য কুঁচকে গেল স্বর্ণলতার।

গলার স্বরে, কপালের ভাঁজে, বিরক্তির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তবু সুজাতা প্রায় মরিয়া হয়েই বলল, 'আপনি বরং এক কাজ করুন মা। কাকিমা সব ব্যাপারে উদাসীন। হিসেব-টিসেব বোঝেন না। বাবুন ঠিক সুস্থ নয়। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টগুলো সোনার সঙ্গে করে নিন।'

পলকহীন সুজাতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন স্বর্ণলতা। তারপর বলেন, 'তোমার আপত্তিটা কোথায়?'

'না, মানে—'

স্বর্ণলতা চোখ সরান নি। বললেন, 'সোনা ছেলেমানুষ। টাকাপয়সা প্রপ্রার্টির ব্যাপারে সে কী বোঝে! সমস্ত কিছু গোলমাল করে ফেলবে।'

মিনমিনে গলায় সুজাতা কী বলল, বোঝা গেল না।

স্বর্ণলতা বললেন, 'তুমি কি নিজেকে এ-বাড়ির একজন ভাবো না?'

সুজাতা লক্ষ করল, শুধু স্বর্ণলতাই নন, নিশানাথও ওধারে খাট থেকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। নিশানাথ ক্ষীণ গলায় বললেন, 'তোমার ওপর আমরা খুব নির্ভর করছি বৌমা। আমার হাল তো দেখছই। তোমার শাশুড়ি-মা'র শরীরটাও হঠাৎ হঠাৎ খারাপ হতে শুরু করেছে। 'না' বোলো না। এত টাকা, এত সোনা, এত ফিক্সড ডিপোজিট—তুমি ছাড়া সেসব সামলে রাখার মতো আর কেউ নেই আমাদের।'

বৃদ্ধ মানুষ দু'টি 'না' বলার শক্তিটাই যেন হরণ করে নিলেন। স্বর্ণলতারা তাকে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, বিয়ের পর থেকে সেটা জেনে আসছে সে। কিন্তু তার ওপর ওঁদের যে এমন অগাধ বিশ্বাস, এমন অসীম আস্থা, আগে তা এত স্পষ্ট করে, এমন গভীরভাবে বুঝতে পারেনি সুজাতা। নিজের অজান্তেই যেন বলল, 'ঠিক আছে, আপনার যা বললেন তাই হবে।'

স্বর্ণলতার কপালের কুঞ্চন আর নিশানাথের মুখ থেকে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মিলিয়ে যায়। স্বর্ণলতা বললেন, 'যাও। সারাদিন পরিশ্রম করে এসেছ। তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।'

সন্ধে নেমে গিয়েছিল। কাজের লোকেরা প্রতিটি ঘরে, বারান্দায় আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সুজাতা উঠে পড়ে। চওড়া সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে চোখে পড়ে, বাবুন তার ঘরে চিত হয়ে শুয়ে আছে। অফিসে বেরুবার সময় যেমনটা দেখে গিয়েছিল, এখনও তার চোখে অবিকল সেই রকম পাগলাটে দৃষ্টি। বোঝা

যাচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠবে। হাতের কাছে যা পাবে, ভেঙে চুরমার করে ফেলবে। বাড়ির লোকজনকে মেরে ধরে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে। ওবেলা বাবুনকে দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন আরও খারাপ হল।

আরেকটু এগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে এল সুজাতা। সোনার ঘরের দারজা খোলা রয়েছে। কলেজ থেকে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে সে। কিন্তু তাকে দেখা গেল না। হয়তো বাথরুমে ঢুকেছে।

অফিস থেকে ফেরার পর রোজ যা চোখে পড়ে, আজও হুবহু তেমনটাই দেখা যাচ্ছে। কাকিমার ঘরে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পুজো এবং আরতির আয়োজন চলছে।

নিজের ঘরে এসে সুজাতা দেখল, আলো জ্বলছে। সে জানে, সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা তার ঘরে আলো জ্বালিয়ে দেয়।

বাইরের শাড়িটাড়ি পালটে হাতমুখ ধুয়ে পাতলা কিমোনো ধরনের পোশাক পরে নিল সুজাতা। তারপর খাটে উঠে বালিশে ভর দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে শরীর এলিয়ে দিল। শারীরিক ক্লান্তি তো ছিলই। সারা দিনে একের পর এক কত কিছুই তো ঘটে গেছে। অপ্রত্যাশিত। আগে থেকে সেসব কল্পনাও করা যায়নি। ভেতরে ভেতরে তার প্রতিক্রিয়ায় তীব্র অবসাদ জমা হয়েছিল। সুজাতার চোখ বুজে আসতে লাগল।

শ্যামা বোধহয় তার গায়ের গন্ধ পায়। সুজাতা শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিনের মতো ট্রেতে চা এবং খাবার-টাবার সাজিয়ে সে হাজির হল। খাট থেকে খানিক তফাতে নিচু সোফা আর সেন্টার টেবল রয়েছে। টেবলে ট্রে নামিয়ে খাবারের প্লেট, টি-পট-টট সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'বৌদি এস।'

রোজ সুজাতা অফিস থেকে ফিরে যখন চা এবং খাবার-টাবার খায়, শ্যামা কাছে বসে সমানে বকর বকর করতে থাকে। মেয়েটা চুলবুলে পাখির মতো। ওকে খুবই ভালো লাগে সুজাতার। কিন্তু আজ কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। কেউ কাছে বসে থাক, সেটাও চাইছে না সে। নির্জন ঘরে সুজাতা নিজেকে একাকী পেতে চায়। নিজের কাল্পনিক প্রতিবিম্ব সামনে রেখে চায় নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে। বলল, 'শ্যামা, তুই চা রেখে খাবারগুলো নিয়ে যা।'

শ্যামা অবাক। অফিস থেকে এসে সুজাতা জলখাবার খায়নি, এমন কখনও হয় না। বড় বড় চোখে তাকিয়ে সে বলল, 'খাবে না! সারা দিন আপিসে অ্যাত

খেটে এলে। রাত্তিরে খেতি তো ঢের দেরি। একন এট্টু কিচু না খেলে শরীর খারাপ করবে ঝে (যে) গো—'

আজ রজতাভর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তারপর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়েও দু'টো সন্দেশ খেতে হয়েছে। সুজাতা বলল, 'আমার খিদে নেই।'

শ্যামার বিস্ময়ের মাত্রাটা শতগুণ বেড়ে যায়। যেদিন এ-বাড়িতে প্রথম কাজ করতে আসে তখন থেকেই সে দেখে আসছে তার এই বৌদিটি ভারি হাসিখুশি। তার সঙ্গে কত গল্প করে, কত মজা করে। কিন্তু আজ কেমন যেন গম্ভীর, চুপচাপ। শ্যামার মতো সরল মেয়ের কাছেও পরিবর্তনটা ধরা পড়েছে। খাওয়ার জন্য জোর করতে সাহস হয় না শ্যামার। ধীরে ধীরে উঠে পড়ে সে। বলে, 'খাবারগুনো রান্নাঘরে রেকে আসচি।'

রোজ এই সময়টা বেশ কিছুক্ষণ সুজাতার কাছে কাটিয়ে যায় শ্যামা। আজও তার সেই রকম ইচ্ছা। সুজাতা সেটা বুঝতে পারছিল। তবু বলল, 'এখন আর আসতে হবে না। পরে চায়ের কাপ-টাপগুলো নিয়ে যাস।'

মুখটা কালো হয়ে যায় শ্যামার। নিঃশব্দে খাবারের প্লেটগুলো নিয়ে চলে যায় সে।

মেয়েটাকে এভাবে বিদায় করার জন্য খারাপ লাগছিল সুজাতার। কিন্তু এখন কারও সঙ্গেই কথা বলতে ভালো লাগছে না। এমন একেকটা সময় আসে যখন নিঃসঙ্গ থাকাটা খুব প্রয়োজন। একা একা নিজের ভেতরের অতল স্তর যেন স্পষ্ট করে দেখে নেওয়া যায়। অন্য কেউ কাছে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। একটু পরেই তার ভাবনা থেকে শ্যামা একেবারেই মুছে যায়। ফিরে আসে পুরনো চিন্তাটা।

আজকের মতো এত ঘটনাবহুল দিন সুজাতার জীবনে আর কখনও আসেনি। আজ প্রতিটি মুহূর্তে ছিল নাটক, প্রতিটি মুহূর্তে বিস্ময়। রজতাভর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে যাওয়া, সেখানে থেকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস, বিয়ের আগাম নোটিশ, বাড়ি ফেরার পর নিশানাথ আর স্বর্ণলতার সঙ্গে ব্যাঙ্কের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে তার নাম জুড়ে দেওয়া—একের পর এক চমক। নিশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া যাচ্ছিল না। একটা কিছু ঘটে যাবাব পরক্ষণে নতুন কী ঘটতে চলেছে, আগেভাগে তার হদিস মিলছিল না। ফলে দিশেহারা হয়ে পড়ে সুজাতা। কোনও কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ভাগ্য নিয়তি ললাটলিপি—এ সব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় নি সে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অদৃশ্য, প্রবল

শক্তিমান কিছু একটা আছে। জাগলার যেমন একসঙ্গে দশটা বল নিয়ে নানা কায়দায় লোফালুফি করতে করতে তাক লাগিয়ে দেয় তেমনই কেউ, ভেলকি কাকে বলে, আজ তাকে তা টের পাইয়ে দিয়েছে।

শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সুজাতার সম্পর্কটা খুব সরু সুতোয় আটকে ছিল। বিকেল বেলায় আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে যখন সে রজতাভর সঙ্গে বিয়ের নোটিশে সই করে, ভেবেছিল, ক'দিন আর। পলকা সুতোটা পট করে ছিঁড়ে যাবে। 'দত্ত ম্যানসন'-এর সঙ্গে সমস্ত কিছু চুকেবুকে যাবে চিরকালের মতো। কিন্তু স্বর্ণলতারা তার সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে আলগা সম্পর্কে একটা শক্ত গিঁট লাগিয়ে দিলেন।

মাথার ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। একদিকে রজতাভ অপার আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। অন্যদিকে স্বর্ণলতারা আরও জোরালো ভাবে তাঁকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। সুজাতা আর ভাবতে পারছিল না। স্নায়ুমন্ডলী ঝিমিয়ে আসছে। একসময় চোখ বুজে এল তার।

ওধারে সেন্টার টেবলে চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

সাত

কারও ডাকে ঘুম ভেঙে গেল সুজাতার। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। দেখল খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সোনা।

বেশ অবাক হল সুজাতা। এ-সময় সোনা কখনও তার ঘরে আসে না। নিজের পড়াশোনায় ডুবে থাকে। পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট কর' ছাড়া কোনও দিকে তার লক্ষ্য নেই। আকাশ ভেঙে পড়ুক, পৃথিবী রসাতলে তলিয়ে যাক, সন্ধে হলে পড়ার টেবল থেকে তাকে তোলা যাবে না।

সোনা জিগ্যেস করে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

এই তরুণীটি সুজাতার খুবই প্রিয়। স্বভাবটি ভারি মিষ্টি। ওকে দেখলে, ওর সঙ্গে কথা বললে, মন ভালো হয়ে যায়।

সুজাতা একটু হাসল।—'না রে, অফিস থেকে ফিরে একটু শুয়েছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই। দাঁড়িয়ে কেন? ব'স না—' সে সোনাকে তুই করেই বলে।

সোনা বিব্রত বোধ করে। বলে, 'দিলাম তো তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে। ঠিক আছে, তুমি ঘুমোও। পরে আসব'খন। কাল কি পরশু—'

সোনার কাঁধ ধরে খাটে বসিয়ে দেয় সুজাতা। বলে, 'আর এখন ঘুম আসবে না। অনেক রাত পড়ে আছে। খাওয়াদাওয়ার পর আবার ঘুমনো যাবে।'

সোনা উত্তর দেয় না।

সুজাতা মজার সুরে এবার জিগ্যেস করে, 'লেখাপড়া লাটে তুলে মেধাবিনী ছাত্রীটি এ-সময় হঠাৎ আমার ঘরে? আগমনের নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে, তাই না?'

নীরবে মাথা নাড়ে সোনা—আছে।

'বলে ফেল।'

তক্ষুনি উত্তর দেয় না সোনা। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কী ভাবতে থাকে।

সুজাতা তাড়া লাগায়, 'কিরে, চুপ করে আছিস কেন? যা বলতে এসেছিস—বল।'

সোনার মধ্যে কোথাও একটা দ্বিধা চলছে। ঝোঁকের মাথায় এ-ঘরে চলে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু বলা ঠিক হবে কিনা, ভেবে উঠতে পারছে না।

সুজাতা সোনার দিকে খানিকটা এগিয়ে আসে। চোখ কুঁচকে লঘু সুরে বলে, 'কী ব্যাপার রে, তোর মতো স্মার্ট মেয়ের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না যে?' স্বরটা অচমকা অনেকখানি নামিয়ে ফিসফিস করে জানতে চায়, 'প্রেমে ট্রেমে পড়েছিস নাকি?

সঙ্কোচটা এবার ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দেয় সোনা। বলে, 'তোমাকে সব বলছি বৌদি—'

'আমি শোনার জন্যে প্রস্তুত। শুরু করে দাও—'

সোনা সবিস্তার জানিয়ে দিল। একটি ছেলের সঙ্গে বছরখানেক আগে তার আলাপ হয়েছে। নাম রাজশেখর। ওরা সাউথ ইন্ডিয়ান। পদবি পাই। ওর বোন পদ্মা সোনার সঙ্গে একই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে ওদের ভবানীপুরের বাড়িতে সোনাকে নিয়ে গেছে সে।

পদ্মাদের ছোট সংসার। বাবা মা এক ভাই আর দুই বোন। সবার বড় দিদি, নাম সুধা। তার বিয়ে হয়েছে একটি গুজরাতি ছেলের সঙ্গে। ওরা থাকে ল্যান্সডাউন রোডে। তারপর পদ্মা।

পদ্মার বাবা চন্দ্রশেখর পাই বি.এ পাশ করে লাইফ ইন্সিওরেন্সে চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তারপর আর দেশে ফিরে যাননি। এই শহরেরই বহু দিনের বাসিন্দা এক পাঞ্জাবি হিন্দু পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে এখানেই থেকে গেছেন। আগে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন। পরে ভবানীপুরে ইন্দ্র রায় রোডে ছোট একটা বাড়ি কিনেছেন।

পদ্মারা কলকাতাতেই জন্মেছে। 'পাই' পদবিটা ছাড়া দক্ষিণ ভারতের ছিটেফোঁটাও আর ওদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। পরিষ্কার বাংলা বলে, লিখতেও পারে। আগাপাশতলা বাঙালি হয়ে গেছে।

পদ্মার দাদা এম.কমে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে একটা বড় ফার্মে চাকরি নিয়েছে। সেই সঙ্গে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপের কোর্সটাও চালিয়ে যাচ্ছে।

বলতে বলতে একটু থামল সোনা।

অনন্ত কৌতূহল নিয়ে শুনছিল সুজাতা। এবার বলল, 'পাই ফ্যামিলির জিনিয়ালজিক্যাল হিস্ট্রিটা শোনা গেল। এখন আসল ব্যাপারটা বল তো মাই ডিয়ার সুইট লেডি—'

সুজাতার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সোনা বলল, 'তুমি যেন কিছুই বুঝতে পারনি!'

খুব ভালোমানুষের মতো মুখ করে সুজাতা বলল, 'বুঝতে তো একটু একটু পারছি। তবে তোমার মুখ থেকেই সেটা শুনতে চাই।' তার ইচ্ছে করছিল, সোনাকে নিয়ে একটু মজা করে।

'আমি বলব না। যাচ্ছি—' সোনা প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

হাত ধরে তাকে ফের বসিয়ে দিতে দিতে সুজাতা বলল, 'দেবযানী দত্ত থেকে দেবযানী পাই হতে চাইছিস—এই তো?'

চোখ নামিয়ে সোনা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

সুজাতা বলে, 'কিন্তু এখন তোমার পড়াশোনা চলছে। মিনিমাম গ্র্যাজুয়েশনটা তো কমপ্লিট করা দরকার।'

ব্যস্তভাবে সোনা হাত এবং মাথা ঝাঁকাতে থাকে, 'না না, যা হবার এম.এ পরীক্ষার পর হবে। ওরা বলেছে, এম.এ'র পর রিসার্চ করে কোনও কলেজে পড়াই। আমারও তাই ইচ্ছা।'

'ফাইন। কিন্তু এসব কি মুখের কথায় হয়ে যায়? তার জন্যে খাটতে হয় না?'

সোনা বলল, 'না খাটলে, এম.এ'তে ভালো রেজাল্ট না করলে, রিসার্চ করব কী করে?'

'তা হলে অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে পড়াশোনার ওপর বেশি করে অ্যাটেনশনটা দাও।'

'সে তো দিচ্ছিই। আমাকে কখনও ফাঁকি দিতে দেখেছ বৌদি?'

'তা দেখিনি।' সুজাতাকে এবার বেশ গম্ভীর দেখায়, 'কিন্তু রাজশেখর পাই নামে যে যুবকটি তোমার স্কন্ধে আরোহণ করেছেন তিনি কি তোমার মনোযোগ

বইয়ের পাতায় রাখতে দেবেন? কলেজ পালিয়ে কতদিন তার সঙ্গে চরে বেড়িয়েছিস?'

দারুণ একটা শক খেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল সোনা। জোরে জোরে হাত এবং মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'না না, মোটেও না। কী যে বলছ বৌদি! নো নো, নট অ্যাট অল—'

'আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল তো—'

একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নেয় সোনা। হাতের নখ খুঁটতে থাকে।

সুজাতা বলল, 'বুঝেছি। শোন, আমার ভেতর একটা 'লাই ডিটেক্টর' রয়েছে। আমার সামনে বসে কেউ মিথ্যে বললে ঠিক ধরা পড়ে যায়।'

বারকয়েক ঢোক গিলে কাঁচুমাচু মুখে সোনা বলে, 'ওনলি টু ডেজ। একদিন ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখেছিলাম। আরেকদিন রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়েছি।'

'নো মোর। এখানেই কলেজ পালানোর ইতি করে দাও।'

'না না, আর কক্ষনো যাব না।'

'গুড।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ভয়ে ভয়ে সোনা বলে, 'গ্র্যাজুয়েশনের পর এম.এ, তারপর রিসার্চ। বেশ কয়েক বছর লেগে যাবে। তাই—'

সুজাতা জিগ্যেস করে, 'তাই কী?'

'আমার ইচ্ছে, আগে থেকেই আমাদের ব্যাপারটা ঠিক করে রাখা। মানে—'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিল সুজাতা। বলল, 'মানে দু'বাড়িতেই কথাবার্তা পাকা হয়ে থাক—এই তো?'

আস্তে মাথা নাড়ে সোনা, 'হ্যাঁ—'

একটু ভেবে সুজাতা বলল, 'দ্যাখ সোনা, বিয়েটা ছেলেখেলা নয়। যদি কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নাও লাইফ চিরকালের মতো রুইনড হয়ে যাবে।'

'কী বলতে চাইছ তুমি?'

'রাজশেখর ছেলেটা ঠিক কেমন?'

'ওর মতো চমৎকার ছেলে খুব কম দেখা যায়। ভারি সরল। চালিয়াতি নেই। কোনও রকম নেশা টেশা করে না।' একটি সৎ অমায়িক ভদ্র নিষ্পাপ যুবকের ছবি চোখের সামনে তুলে ধরে সোনা।

সুজাতা বলে, 'তোদের মতো কম বয়েসের ছেলেমেয়েরা ভীষণ ইমোশানাল হয়। সব কিছু তাদের কাছে রঙিন। পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে

তারা ভেসে বেড়ায়। রিয়ালিটি যে কী কঠিন ব্যাপার সে সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণাই থাকে না। তোর কোনও ভুল হচ্ছে না তো?'

সোনা জোর দিয়ে বলে, 'না, বৌদি। আমি শুধু ওকেই না, ওদের ফ্যামিলির সবার সঙ্গেই মিশেছি। সবাই চমৎকার। আমার কোনও রকম ভুল হয়নি।'

সুজাতা আঁচ করে নেয়, সোনা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সে বলে, 'ঠিক আছে, পরে এ-নিয়ে ভাবা যাবে। হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে।'

'কিন্তু বৌদি, একটা সিরিয়াস প্রবলেম রয়েছে যে—'

'সেটা আবার কী?'

'আমার মা, তোমার শাশুড়ি। গ্রেট ডিক্টেটর স্বর্ণলতা দত্ত। মা যখন জানতে পারবে, আমাকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলবে। দিদির ব্যাপারটা জানো না?'

চকিতে মনে পড়ে যায় সুজাতার। সোনা অঞ্জনদের দিদি জয়ন্তী বাড়ির অমতে একটি ইউ পি'র ছেলেকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে। স্বর্ণলতা এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে মেয়ে আর অবাঙালি জামাইকে 'দত্ত ম্যানসন'-এর চৌহদ্দিতে ঢুকতে দেননি।

বছর কয়েক মোটামুটি কাটার পর শ্বশুরবাড়িতে প্রচন্ড অশান্তি শুরু হয়েছে জয়ন্তীর। ওর শ্বশুরদের পারিবারিক বিজনেস রয়েছে। খুব বড় কিছু নয়। আগে মোটামুটি চলত। পরে লোকসান হতে লাগল। আর তখন থেকেই জয়ন্তীর ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে, বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এস। কিন্তু 'দত্ত ম্যানসন'-এর দরজা তার কাছে চিরকালের মতো বন্ধ। যেখানে নিজেই ঢুকতে পারছে না, সেখান থেকে টাকা আনবে কী করে?

জয়ন্তীর বিয়েটা যে আদৌ সুখকর হয়নি, উঠতে বসতে মেয়েটা চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করছে, সব খবরই পান স্বর্ণলতা। কিন্তু কিছুই তাঁকে বিচলিত করে না। এ-বাড়ির লোকেদের জন্য বিস্তর নিষেধাজ্ঞা তিনি জারি করে রেখেছেন। তার বাইরে পা বাড়ালে নিস্তার নেই। জয়ন্তী মরুক বাঁচুক, তিনি ফিরেও তাকাবেন না। ব্যাপারটা এইরকম। সিদ্ধান্ত তুমি নিয়েছ, তার ফলভোগ তোমাকেই করতে হবে।

জয়ন্তী মাঝে মধ্যে সুজাতাকে তার অফিসে ফোন করে ভীষণ কান্নাকাটি করে। ওর কথা শুনলে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। সে জয়ন্তীকে নিজের থেকে টাকা দিতে চায়। কিন্তু ওর প্রবল আত্মসম্মান বোধ। কোনও ভাবেই তার টাকা নিতে রাজি হয় না। শ্বশুরবাড়িতে একটা মরণফাঁদে আটকে গেছে যেন। সেখান থেকে কীভাবে বেরুবে, আদৌ বেরুতে পারবে কিনা, কে জানে।

জয়ন্তী নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেছে। সেই পথেই চলেছে সোনা। সুজাতা বলল, 'মা'র রি-অ্যাকশন কী হবে, তা তো জানিস। এই অবস্থায়—'

সুজাতার কোলে মুখ গুঁজে সোনা বলল, 'আমি কিছু জানি না। মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তোমাকেই রাজি করাতে হবে।'

সুজাতা অস্বস্তি বোধ করে। —'আমার কথা উনি কি শুনবেন?'

'একমাত্র তোমার কথাই মা শোনে। আমি কিন্তু তোমার ওপর ডিপেন্ড করে থাকব বৌদি—'

'বুঝেছি, বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা আমাকেই বাঁধতে হবে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর সুজাতা বলে, 'তুমি কি জানো মা'র শরীর খুব খারাপ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, জানি। ডাক্তার এসে দেখে গেছে।'

'আজকাল প্রায়ই মা'র শরীর খারাপ হচ্ছে।'

'হ্যাঁ—'

'এই অবস্থায় তোর কথা বলা ঠিক হবে না।'

'না না, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আমার গ্র্যাজুয়েশনটা হয়ে যাক। তারপর মা'র মুড-টুড বুঝে বোলো। তোমাকে সব বলে রাখলাম। এখন আমি নিশ্চিন্ত। জানি যা করার তুমি করে দেবে।'

মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে বিয়ের নোটিশটা দিয়ে এসেছে সুজাতা। তার বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আজই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দায়িত্ব হুড়মুড় করে তার কাঁধের ওপর এসে পড়তে শুরু করেছে।

সোনার দিকে তাকায় সে। তার ওপর মেয়েটার কত যে প্রত্যাশা, কত যে আস্থা! মাথার ভেতরটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল সুজাতার। সে যে এখান থেকে চলে যাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে, সেটা মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল। বলল, 'ঠিক আছে, মাকে বুঝিয়ে বলব।'

আবেগে, খুশিতে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে সোনা।—'বৌদি, ইউ আর গ্রেট।'

'ছাড় ছাড়—'

সুজাতার গালে নাক ঘষে অনেক আদর টাদর করে চলে গেল সোনা।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে সুজাতা। ভাবছিল, সম্পর্কের পাকগুলো খুলে খুলে সে চলে যেতে চাইছে, কিন্তু নতুন করে নিশানাথ স্বর্ণলতা বা সোনা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। রজতাভ তাকে নিয়ে যে ভবিষ্যতের কথা ভেবেছে সেটা কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

আট

কয়েকটা দিন কেটে গেল।

'দত্ত ম্যানসন'-এর জীবন এক নিয়মে একই খাতে বয়ে চলেছে। কোথাও তেমন কোনও পরিবর্তন নেই।

এর মধ্যে চার-পাঁচটা ব্যাঙ্কের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে সুজাতার নাম উঠে গেছে। বাবুনের চোখেমুখে যে অস্বাভাবিক ভাব ফুটে উঠেছিল সেটা তেমনই আছে। ছেলেটা এখনও ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠেনি। যে ডাক্তার ওর ট্রিটমেন্ট করেন তিনি এখন চেন্নাইতে। সেখানে চিফ গেস্ট হিসেবে একটা সেমিনারে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সুজাতা তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিল। তিনি বলেছেন, কলকাতা ফিরেই বাবুনকে দেখতে আসবেন। এদিকে স্বর্ণলতা সেই যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, মাঝখানে দু'তিন দিন ভালো থাকার পর আবার পেটের ব্যথাটা চাড়া দিয়েছিল। হাউস ফিজিসিয়ান ডাক্তার দাশগুপ্ত এসে সকালে ইঞ্জেকশন দেওয়ায় কষ্টটা কমেছে ঠিকই, তবে তিনি ব্লাড টেস্ট, এক্স-রে, আলট্রা-সোনোগ্রাফি, বেরিয়াম মিল — সব কিছু করিয়ে নেবার জন্য বার বার চাপ দিচ্ছেন কিন্তু স্বর্ণলতা শুনলে তো! তাঁর ধারণা, ব্যথার কারণ বদহজম উইন্ড ইনসমনিয়া। তাঁর জন্য উতলা হবার দরকার নেই। বয়স বাড়লে এ ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। ওষুধটোষুধ চলছে। পেটের যন্ত্রণা সারতে বেশি সময় লাগবে না।

এই ক'দিন রজতাভর সঙ্গে দেখা হয়নি। ফ্যাক্টরি, প্রোডাকশন নিয়ে এমনই ব্যস্ত ছিল যে তার পক্ষে অন্য কোথাও নড়ার উপায় ছিল না। রাতে সুজাতার সঙ্গে ফোনেই যা কথা হয়েছে।

আজ ছুটির ঠিক আগে আগে সুজাতার ব্যাঙ্কে হাজির হল রজতাভ। মাত্র কয়েক মিনিট বসতে হল তাকে। তারপর তার গাড়িতে সুজাতাকে তুলে সোজা চলে এল পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয়। সুজাতার অফিসের গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে এল। রেস্তোরাঁয় খানিকটা সময় কাটাবার পর সেটা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

ভিড়-টিড় এড়িয়ে একটা নিরিবিলি কোণে গিয়ে বসল ওরা। স্টুয়ার্ডকে কফি এবং খাবারের অর্ডার দিয়ে রজতাভ বলল, 'উঃ, কতদিন বাদে আমাদের দেখা হল বল তো?'

একটু রগড় করতে ইচ্ছা হল সুজাতার। —'ক'দিন আর! দু'তিন দিন হবে—'

চোখ গোল করে রজতাভ বলল, 'পাক্কা সিক্স ডেজ। আমার মনে হচ্ছিল সিক্সটি ইয়ারস তোমাকে দেখিনি। ফ্যাক্টরিতে আটকে থাকতে থাকতে ভাবছিলাম, স্রেফ মরে যাব। আই উড ডাই। আজ আর পারলাম না। যা হবার হোক। সব ফেলে ডেসপারেটলি বেরিয়ে পড়লাম।'

'বেশ করেছ—' সুজাতা লঘু সুরে বলল ঠিকই, কিন্তু টের পেল বুকের ভেতরটা অস্বস্তিতে ভরে যাচ্ছে। সে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে, এর পর কী কী বলবে রজতাভ, তার যাবতীয় অভিলাষ একের পর এক তুলে এনে কীভাবে তার সামনে সাজিয়ে দেবে।

য ভাবা গিয়েছিল তা-ই। রজতাভ বলল, 'রেজিস্ট্রেশন ম্যারেজ হচ্ছে। খুব একটা হইচই করার ইচ্ছে নেই। ভেরি সিম্পল সেরিমনি। তবে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে গিয়ে দু'টো সই লাগিয়ে স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেল, ব্যাপারটা ন্যাড়া ন্যাড়া লাগবে। আমি ঠিক করেছি ওই দিনটা আমার দু'চারজন ফ্রেন্ডকে ডাকব, তুমিও তোমার বন্ধুদের ডেকো। ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে গেলে কোনও হোটেলে গিয়ে একটু খাওয়াদাওয়া করা যাবে। বিয়েটা যে-রকমই হোক, অন্য একটা প্ল্যান আমি করে রেখেছি।'

রজতাভকে বিশ্বাস নেই। তার মাথায় এমন সব পরিকল্পনা খেলে, আগে থেকে হদিস মেলে না। মানুষকে চমকে দিতে ওর জুড়ি নেই। এই তো সেদিন, কোনও রকম আভাস না দিয়ে, দুম করে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের অফিসে সুজাতাকে টেনে নিয়ে বিয়ের নোটিশ দিয়ে এল। আগেভাগে ঘুণাক্ষরেও কি টের পেয়েছিল সুজাতা! সেখানে এমন এক নাটকীয় সিচুয়েশন তৈরি করল যে নোটিশে সই না দিয়ে পারেনি সে। সেই জাতীয় চমকদার কোনও মতলব কি এঁটেছে রজতাভ? প্রবল অস্বস্তি হতে থাকে সুজাতার। জিগ্যেস করে, 'কী প্ল্যান?'

রজতাভ হাত-টাত ঝাঁকিয়ে, গলার স্বর কয়েক পর্দা উঁচুতে তুলে, বলতে লাগল, 'বৌভাতটা কিন্তু গ্র্যান্ড স্কেলে করব। লোকে একেবারে টেরিয়ে যাবে। বলবে, হ্যাঁ একটা বিয়ের মতো বিয়ে হয়েছে। ম্যারেজ অফ দিস সেঞ্চুরি।' তার চোখমুখ থেকে উচ্ছ্বাস ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে থাকে।

কাছে-দূরে অন্য টেবলগুলোতে যারা ছিল, তারা ঘাড় ফিরিয়ে রজতাভর দিকে তাকায়। এই ধরনের বনেদি রেস্তোরাঁয় এসে কেউ এমন হইচই করে না।

সুজাতার অস্বস্তি আরও বেড়ে যায়। বলে, 'আস্তে, আস্তে। সবাই আমাদের দেখছে।'

'সরি—' রজতাভ গলা নামায় ঠিকই, তবে উচ্ছ্বাসটা থেকেই যায়। একটু নিচু স্কেলে সে বলে, 'ফাইভ-স্টার হোটেলের ব্যাঙ্কুয়েট হল-এ ফাংশনটা করব, না কোনও বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে, ভালো করে ডেকোরেট করে করা হবে? তোমার কী ইচ্ছে?' সুজাতার জবাবের তোয়াক্কা না করে রজতাভ বলতে লাগল, 'কম করে সেভেন টু এইট হানড্রেড ইনভাইটিস হবে। আমি আমার গেস্টদের লিস্ট করতে শুরু করেছি। তুমিও দেরি কোরো না। নেমন্তন্নটা সব চেয়ে ঝামেলার ব্যাপার। শেষ মুহূর্তে হয়তো দেখবে দু'চারজন ঘনিষ্ঠ রিলেটিভ বা ফ্রেন্ডের নাম বাদ পড়ে গেছে। সেটা ভীষণ এমব্যারাসিং। তাই না? লিস্ট করার পর ভালো করে স্ক্রুটিনি করবে। আর হ্যাঁ, আরেকটা ইমপর্টেন্ট পার্ট হল খাওয়া দাওয়া। একটা দুর্দান্ত ভোজের ব্যবস্থা করতে হবে। হোটেলে ফ্যাংশন হলে ওরাই সেটা করবে। কিন্তু বাইরে বাড়ি-টাড়ি নিলে নিজেদেরই অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। কোন কেটারারকে ডাকা যায় বল তো?'

সুজাতা উত্তর দিল না।

রজতাভ নিজের ঝোঁকেই বলে যায়, 'আমি তো কলকাতায় অনেকদিন থাকি না। কোন কেটারার সব থেকে নাম-করা জানি না। তুমি কি বলতে পারবে? আর হ্যাঁ, মেনুটা কী হবে, দু-একদিনের ভেতর কিন্তু ঠিক করা দরকার—' একটানা বকতে বকতে হঠাৎ তার খেয়াল হয়, সুজাতা একেবারে চুপ। নিরুৎসুক মুখ, কেমন যেন অন্যমনস্ক।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ সুজাতাকে লক্ষ করে রজতাভ। তারপর বলে, 'কী হল? একটা কথাও বলছ না যে! কী ভাবছ?'

সুজাতা একটু চমকে ওঠে। বিয়ের নোটিশে সে সই দিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু বৌভাত টাতের কথা একবারও তার মাথায় আসেনি। বিয়ের সঙ্গে ওটা যে জড়ানো, সেটা ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু মাঝখানে যা সব ঘটে গেছে তাতে অন্য দিকে তাকানোর সময়ই পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, বৌভাতের অনুষ্ঠানে বিরাট রিসেপশনের আয়োজনের কথা শুনে ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে তার। সুজাতা জানায়, একবার প্রচুর জাঁকজমক করে তার বিয়ে হয়েছিল। দু'নম্বর বিয়েতেও যদি তেমনি আড়ম্বর করা হয়, লোকে কী বলবে? গাদা গাদা লোক ডেকে হইহই বা ঘটার দরকার নেই। তার ইচ্ছা যাদের না ডাকলেই নয়, এই ধরনের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকে ডেকে ছোটখাটো ছিমছাম একটা অনুষ্ঠান করা উচিত। চোখধাঁধানো সমারোহটা খুবই দৃষ্টিকটু হবে।

সুজাতার ইচ্ছাটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় রজতাভ। ফের গলা চড়ায় সে, 'তোমার না হয় এটা সেকেন্ড ম্যারেজ, আমার তো ফার্স্ট। আর বিয়েটা একবারই করব। ভালো বাংলায় কী যেন বলে—সাধ-আহ্লাদ—সেটা আমাকে মেটাতে দেবে না?'

অন্যায় কিছু বলেনি রজতাভ। বেয়াড়া কোনও দাবিও করছে না। বিয়েতে ধুমধাম করতে কে না চায়? বিব্রত সুজাতা উত্তর দেয় না।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, সেইভাবে রজতাভ এবার বলে, 'আরে ভেরি ইমপর্টান্ট ব্যাপারটাই খেয়াল ছিল না। আমরা যে বিয়ে করতে চলেছি, তোমার দাদা-বৌদিকে জানিয়েছ?'

সুজাতা হকচকিয়ে যায়। বলে, 'না— মানে—' আসলে স্বর্ণলতারা যেভাবে এর মধ্যে শতপাকে তাকে জড়িয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করেছেন, দাদা-বৌদির কথা মনেই পড়েনি।

'স্ট্রেঞ্জ। আজকের দিনটা বাদ দিলে হাতে আর তেইশটা দিন রয়েছে। এখনও ওঁদের না জানালে, অফিসে ছুটির ব্যবস্থা করে ঠিক সময়ে কোনও ভাবেই আসতে পারবেন না। বোন কার হাতে গিয়ে পড়ল—সে ভদ্রলোক না ডেভিল—নিজের চোখে তোমার দাদা-বৌদির দেখা উচিত।' একটু থেমে ফের বলে, 'এ তো দু' মিনিটের ব্যাপার। ফোনের ক'টা বাটন টিপবে। ব্যস। আজ রাত্তিরেই কিন্তু ফোনটা করবে। ভুলো না—'

আনমনা সুজাতা বলে, 'দেখি—'

'দেখি না—' রজতাভ জোর দিয়ে বলে, 'করতেই হবে। শুভকাজে গুরুজনদের ব্লেসিংটা দরকার।'

একটু চুপচাপ।

তারপর খানিকটা দ্বিধার সুরে রজতাভ বলল, 'তোমার এখনকার শ্বশুরবাড়িতেও জানাবার কথা ছিল। ওঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে কি?'

আবছা গলায় সুজাতা বলে, 'না—'

একটু ভেবে রজতাভ বলল, 'তোমার প্রবলেম কোথায়, বুঝতে পারছি। ওই বাড়িতে থেকে বিয়ের কথাটা বলা ভীষণ মুশকিল।'

সুজাতা জবাব দেয় না।

রজতাভ বলল, 'একটা কাজ করা যাক। আমিই বরং দু-একদিনের ভেতর তোমার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। ওঁদের বুঝিয়ে বলব। তোমার দাদা-বৌদির ফোন নাম্বারটা দাও। তাঁদের—'

সুজাতা আঁতকে ওঠে, 'না না, আমার শ্বশুরবাড়ি তোমাকে যেতে হবে না। যা বলার আমিই ওঁদের বলব। দাদা-বৌদির সঙ্গেও যোগাযোগ করব।'

'ঠিক আছে, ওই কাজগুলো একটু তাড়াতাড়িই কোরো—'

সুজাতা ভাসাভাসা ভাবে বলে, 'তোমার কথাটা আমার মনে থাকবে—'

'আরেকটা পয়েন্ট ভেবে দেখেছ?' রজতাভ প্রশ্নটা করল সুজাতার চোখের দিকে তাকিয়ে।

'কী পয়েন্ট?'

'তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে বিয়ে করতে যাওয়াটা—, বলতে বলতে থেমে যায় রজতাভ।

এই দিকটা আগে কখনও চিন্তা করেনি সুজাতা। একটি বিধবা তরুণী তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বিয়ে করতে যাবে, রজতাভ সেটা মনে করিয়ে দিতেই হকচকিয়ে যায় সে। যদিও বিয়ের দিন তেমন কোনও ঘটা-ই হবে না, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে কয়েকজন বন্ধুকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে গিয়ে সই টই করে কাজটা চুকিয়ে ফেলা, তারপর কোনও হোটেলে গিয়ে তাদের সঙ্গে একটু খাওয়া দাওয়া, ব্যস। প্রায় নিঃশব্দে সব চুকে যাবে। কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু চোরের মতো বিয়েটা সেরে প্রাক্তন শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতে হবে, এটা ভাবতেই তীব্র গ্লানিবোধ বুকের ভেতর শেলের মতো আমূল বিঁধে যায়। মনে হয়, স্বর্ণলতাদের সঙ্গে এটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আচমকা দু'হাতে মুখ ঢেকে প্রায় ভেঙে পড়ে সে। কাঁপা কাঁপা, রুদ্ধ স্বরে বলে, 'না না, 'দত্ত ম্যানসন' থেকে আমি ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে যেতে পারব না। কিছুতেই না।'

রজতাভর উচ্ছ্বাস এবং আবেগের মাত্রাটা অন্যদের চেয়ে অনেকটাই বেশি। কথাও বলে প্রচুর। একবার শুরু করলে সহজে থামতে চায় না। বিশেষ করে সুজাতাকে পেলে তার স্বরযন্ত্র বড় বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার মুখটা লহমায় পাংশু হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে। তারপর বলে, 'তোমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছি। রেজিস্ট্রেশনটা যতই গোপনে করা যাক না, ও-বাড়ি থেকে এসে সেটা করা নিশ্চয়ই একটা সমস্যা।'

সুজাতা নীরবে বসে থাকে।

রজতাভ থামেনি, 'আগে খেয়াল করিনি, এখন বুঝতে পারছি, 'দত্ত ম্যানসন'-এ থেকে তোমার পক্ষে বিয়ের কথাটা ওঁদের জানানোও ভীষণ মুশকিল। কী করা যায় বল তো?'

সে রজতাভ অত্যন্ত সপ্রতিভ, চনমনে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সমস্যাই যে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় তাকেও এখন রীতিমতো বিচলিত দেখাচ্ছে। সুজাতা এক পলক তাকে দেখে চোখ অন্য দিকে সরিয়ে নেয়।

অনেকটা সময় চুপচাপ কেটে যায়। তারপর মুখটা হঠাৎ ঝলমল করে ওঠে রজতাভর। হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'সব প্রবলেম সলভড্।'

সুজাতা অবাক। 'মানে?'

'আমার এক বন্ধু বিভাস তার ফ্যামিলি নিয়ে বালিগঞ্জ প্লেসে থাকে। বিয়ের দিন পনেরো আগে, ভাবছি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। বিভাস আর তার স্ত্রী শালিনী চমৎকার মানুষ। আমার কী ইচ্ছে জানো?'

'কী?'

'তুমি বিয়ের ক'দিন আগে থেকে ওদের কাছে থাকবে। সেইভাবে প্রিপারেশন নাও।'

সুজাতার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। সে বলে, 'তোমার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে থাকব কেন?'

রজতাভ জলের মতো বুঝিয়ে দেয়। শ্বশুর-শাশুড়ির মুখোমুখি বসে নিজের নতুন বিয়ের জন্য অনুমতি নেবার কথা ভাবাটা খুবই অস্বস্তিকর। তার চেয়ে বিভাসদের বাড়ি গিয়ে সেখান থেকে চিঠি লিখে স্বর্ণলতাদের সব জানালেই হবে। অস্বাচ্ছন্দ্য বা চক্ষুলজ্জার কোনও কারণ থাকবে না। শুধু তাই না, সেখান থেকে সে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে চলে যেতে পারবে। পুরোপুরি চাপমুক্ত। চক্ষুলজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ থাকবে না।

নিঃশব্দে সব শুনে গেল সুজাতা।

রজতাভ বলতে লাগল, 'বিভাসরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ওদের বাড়ি যাবার আগে একটা কাজ করলে কেমন হয়?'

এবার সুজাতা বলল, 'কী কাজ?'

'ওদের একদিন কোনও হোটেলে লাঞ্চে ইনভাইট করি। ওরাও থাকবে, আমরাও থাকব। পরিচয়টা তখন হয়ে যাবে। কবে তোমার সুবিধে—'

রজতাভকে থামিয়ে দিয়ে সুজাতা বলল, 'এক্ষুনি বলতে পারছি না। পরে তোমাকে জানাব।'

'বেশি দেরি কোরো না যেন।'

'আচ্ছা—'

নয়

আরও ক'টা দিন কেটে যায়। সময় কমে আসছে দ্রুত। রজতাভর উৎকণ্ঠা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। ফোনে তো বটেই, মাঝে মাঝে সুজাতার অফিসে হানা দিয়েও সমানে তাড়া দিয়ে যাচ্ছে সে। রোজ একই প্রশ্ন, একই উত্তর।

'বিভাসদের ব্যাপারে কিছুই তো বললে না।'

'না, মানে—'

'দাদা-বৌদিকেও কি জানাতে পেরেছ।'

'দু-একদিনের ভেতর ফোন করব।'

অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে রজতাভ। 'আর কবে ওঁদের জানাবে! রিসেপশনের জন্যে বাড়ি ভাড়া করা কি হোটেলের ব্যাঙ্কুয়েট হল বুক করা, বাড়ি নিলে ডেকোরেটর আর কেটারার ঠিক করা—এসব তো কিছুই করতে পারছি না।' একটু চুপ করে থাকার পর জিগ্যেস করেছে, 'একটা কথার ঠিক ঠিক জবাব দেবে?'

সুজাতা জানতে চেয়েছে, 'কী কথা?'

'তোমার কি এ বিয়েতে আপত্তি আছে?'

সুজাতা হকচকিয়ে গেছে। এটা ঠিক, সেদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে নিয়ে গিয়ে, বিয়ের নোটিশ দিয়ে, দারুণ একটা চমক দিয়েছিল রজতাভ। এর জন্য কোনও ভাবেই প্রস্তুত ছিল না সে।

তবে অনেকদিন ধরেই কোনও বিজন দুপুরে বা শুয়ে শুয়ে নিঝুম নিশুতিতে নিজের ভেতরটা আঁতিপাঁতি করে দেখে নিয়েছে সুজাতা। এভাবে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা গোপন ঝাঁপির সন্ধান পায়। সেটার মুখ খুলতেই বেরিয়ে আসে আশ্চর্য এক অভিলাষ। রজতাভকে তার চাই, চাই, চাই। কিন্তু পিছুটানটাও কম জোরালো নয়। অঞ্জন না হয় স্মৃতি হয়ে গেছে। কিন্তু 'দত্ত ম্যানসন'-এর যারা এখনও বেঁচে আছে, হাজার সমস্যার পাকে তারা তাকে জড়িয়ে ফেলছে। সেসব ছিঁড়ে চলে যাওয়া কত যে কঠিন, কত যে দুরূহ, তা অন্যকে বোঝানো যায় না।

সুজাতা বলেছে, 'না না, কিসের আপত্তি? তাই যদি হত, বিয়ের নোটিশে কি সই দিতাম?'

'তা হলে দ্বিধাটা কোথায়?'

সুজাতা উত্তর দেয়নি! প্রচণ্ড অস্বস্তি আর চক্ষুলজ্জা এড়াতে রজতাভ আগেই তাকে ওর বন্ধু বিভাসদের বাড়ি চলে যাবার কথা বলেছিল। অবশ্য ওদের সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি। সুজাতা মুখ থেকে কথা খসানোমাত্র কোনও হোটেলে বিভাসদের লাঞ্চে ডেকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত রজতাভ। সেজন্য নিয়মিত তাড়াই দিয়ে যাচ্ছিল সে। হোটেল থেকে সোজা বিভাসদের বাড়ি চলেও যেতে পারত সে। এভাবে চোরের মতো চলে যেতে তার মন সায় দেয়নি।

সুজাতা অন্য দিক থেকে মনস্থির করে ফেলেছিল। একটু ছলনার আশ্রয় নিয়ে স্বর্ণলতাদের জানাবে কয়েক দিনের জন্য অফিস থেকে তাকে বাইরে পাঠানো হচ্ছে। তার ওপর ওঁদের অগাধ আস্থা। সে যা বলবে ওঁরা চোখ বুজে বিশ্বাস করবেন। তাতে না জানিয়ে যাবার গ্লানির মাত্রাটা কিছুটা হলেও কমবে। বিভাসদের বাড়ি গিয়ে অকপটে 'দত্ত ম্যানসন' ছেড়ে আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়িকে চিঠি লিখবে। কিন্তু অফিসের নাম করে বেরিয়ে আসাটা প্রবঞ্চনাই। যতবার সুজাতা সেটা ভেবেছে, তার মস্তিষ্কে সারাক্ষণ কেউ একটা ধারাল কাঁটা বিঁধিয়ে গেছে। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কী?

রোজই অফিসে বেরুবার সময় এবং ছুটির পর ফিরে এসে স্বর্ণলতাদের সঙ্গে দেখা করে সুজাতা। নিশানাথ তো প্রায় সারা দিনরাতই শুয়ে থাকেন। তাঁর শীর্ণ কাঠামোটা বিছানায় মিশে থাকে। এদিকে স্বর্ণলতার সেই যে পেটের ব্যথাটা আচমকা শুরু হয়েছিল, ওষুধ খেয়ে সেটা সাময়িক কমে এলেও ফের চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে ফের ডাক্তার ডাকতে হয়েছে। মহিলা গ্যাস আর অ্যাসিডিটির ট্যাবলেট খেয়ে চলেছেন অনবরত। কেন ব্যথাটা বার বার হচ্ছে, আসল কারণটা কী, সেটা জানতে হলে থরো চেক-আপ জরুরি। কিন্তু মহিলার অদ্ভুত গোঁ, কিছুতেই তা করবেন না।

স্বর্ণলতা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন, এমন সময় অফিস থেকে বাইরে পাঠাবার কথাটা বলতে গিয়েও বলা যায় নি। ভেতরে ভেতরে যতই মরিয়া হয়ে উঠুক, যন্ত্রণাকাতর, অসুস্থ শাশুড়িকে বলা সম্ভব ছিল না। কেন অসম্ভব ছিল, রজতাভকে জানাতে পারে নি সুজাতা। সে শুধু বলেছে, 'না, কিসের দ্বিধা—'

কাল ছিল শনিবার।

রজতাভ ব্যাঙ্কে এসে বলে গেছে, 'কাল তোমার দাদা-বৌদিকে নিশ্চয়ই ফোন করবে। ইট'স আ মাস্ট।'

সুজাতা বলেছে, 'একেবারে আল্টিমেটাম?'

'ধর তাই। আর পরশুই বিভাসদের লাঞ্চে ডাকছি। হোটেলে সিট রিজার্ভ করে তোমাকে জানিয়ে দেব। ও কে?'

সুজাতা বলে, 'একেবারে পরশুই ঠিক করে ফেললে?'

'হ্যাঁ। তোমার মধ্যে যে বাধাটা আছে, বাইরের কেউ একটু জোর না করলে সেটা নিজের মেন্টাল স্ট্রেন্থে কাটিয়ে উঠতে পারবে না। তাই—'

ঠিকই বলেছে রজতাভ। প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও নিজের ভেতরকার শক্ত উঁচু দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে ভীষণ কঠিন। সুজাতা চুপ করে থাকে।

রজতাভ বলে, 'আর দেরি হলে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্টে গোলমাল হয়ে যাবে কিন্তু—'

একটি যুবক বহুকাল ধরে তার জন্য আশায় আশায় অপেক্ষা করছে। আজ না কাল, কাল না পরশু—এই করে কতদিন আর কাটিয়ে দেওয়া যায়? হঠাৎ অফুরান আবেগে বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে গেছে সুজাতার। সে বলেছে, 'ঠিক আছে, তুমি যা বললে তাই হবে। কালই দাদা-বৌদিকে জানিয়ে দেব।'

চোখমুখ আলো হয়ে উঠেছে রজতাভর। বলেছে, 'কখন ওঁদের জানাবে?'

'বিকেলে ফোন করব।'

উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে রজতাভ। 'ফাইন। আমি তোমাকে ফোন করব সন্ধেবেলায়। বিটুইন সেভেন অ্যান্ড সেভেন-থার্টি।'

'কেন?'

'বা রে, খবরটা শোনার পর দাদা-বৌদির কী রি-অ্যাকশন হল, জানতে হবে না?'

সুজাতা হেসেছে, 'ঠিক আছে, কোরো।'

'পরশুদিনের লাঞ্চের কথাটা কিন্তু ভুলো না।'

'তুমি কি তা ভুলতে দেবে?'

'যা বলেছ—' শব্দ করে খোলা গলায় হেসে উঠেছিল রজতাভ।

আজ রবিবার।

ছুটির দিন বা কাজের দিন বলে সুজাতার কাছে আলাদা কিছু নেই। অসুখ বিসুখ না হলে সাড়ে ছ'টার ভেতর তার ঘুম ভেঙে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

ঘুম ভাঙলে এক লহমাও শুয়ে থাকতে পারে না সে। বাথরুমে গিয়ে মুখ-টুখ ধোয়া, বাসি পোশাক বদলানো, ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে চিরুনি চালিয়ে এলোমেলো চুল ঠিক করে নেওয়া—এসব করতে করতে বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেল। রবিবার, তাই শহরের ব্যস্ততা তেমন নেই। দূর থেকে বাস মিনিবাস আর প্রাইভেট কারের শব্দ ভেসে আসছে। তবে সবই চলছে গড়িমসি চালে। জানালা দিয়ে নিচে রাস্তার লোকজন চোখে পড়ছে। তেমন ভিড় অবশ্য নেই।

রোজ সে কখন কী করবে, সমস্ত কিছু চলে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। রবিবার বলে অফিসে যাওয়াটাই যা হয় না। নইলে অন্য কোনও কিছু যে এদিক ওদিক হবে তার জো নেই। নিয়ম মেনে চলতে চলতে সেটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

অফিসে কীভাবে, কতখানি ব্যস্ততার মধ্যে সুজাতার সময় কাটে শ্যামার জানা নেই। কিন্তু বাড়িতে কখন সে খাবে, কখন স্নান করবে, ক'টা থেকে ক'টা অব্দি ঘুমোবে, সমস্ত শ্যামার মুখস্থ। ঠিক আটটায় সে ট্রেতে সকালের খাবার আর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। বড় টি-পটে লিকার, চিনি এবং দুধের পাত্র, ইত্যাদি।

আজ রান্নার ঠাকুর হিংয়ের কচুরি, আলুর দম আর ছোলার ডাল করেছে। খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল সুজাতা। কাল রজতাভ আল্টিমেটাম দিয়ে যাবার পর থেকে সে ভেবেই চলেছে। দাদা-বৌদিকে নিয়ে তার সমস্যা নেই। রজতাভর মতো একটি সৎ সুশিক্ষিত স্বপ্নদর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবককে সে বিয়ে করছে জানলে ওরা খুবই খুশি হবে। কে আর চায় তার বোন প্রাক্তন শ্বশুরবাড়িতে মৃত স্বামীর স্মৃতি এবং তার মা বাবা ভাইবোনদের অনন্ত দায়িত্ব নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিক। অফিসে যত কাজই থাক, সময় বার করে দাদা-বৌদিরা ঠিক চলে আসবে।

কিন্তু দুশ্চিন্তাটা নিশানাথদের নিয়ে। সুজাতা যখন বিভাসদের বাড়ি গিয়ে চিঠি লিখে বিয়ের ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে, কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে ওঁদের? নিশানাথ কী করতে পারেন সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে সে। বিছানায় মিশে থাকা বৃদ্ধ মানুষটি, যাঁর জীবনীশক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, খুব সম্ভব কিছুই বলবেন না। শুধু বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকবেন। ভয়টা স্বর্ণলতাকে নিয়ে। তিনি হয়তো রাগে, উত্তেজনায় ফেটে পড়বেন। ঘটিয়ে দেবেন হুলস্থূল কাণ্ড। বিয়ের যদি এতই শখ ছিল, অঞ্জনের মৃত্যুর পরই তো সুজাতা এ বাড়ি থেকে

চলে যেতে পারত। এতদিন এখানে পড়ে রইল কেন? কতখানি বিশ্বাস করলে অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে ব্যাঙ্কের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে, লকারে, বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে এবং আরও নানা ইনভেস্টমেন্টে তার নাম দেওয়া যায় সেটা কি সে ভেবে দেখেছে? সেই বিশ্বাসের মর্যাদা কি এভাবে দিতে হয়? 'দত্ত ম্যানসন'-এর সবাই যখন তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে আছে, তখন সে সমস্ত ছেড়েছুড়ে চলে যাবে? লেশমাত্র মনুষ্যত্ব কি তার মধ্যে থাকতে নেই? এতটাই স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অমানুষ সে!

স্বর্ণলতা নিচু গলায় কখনও কথা বলেন না। বিশেষ করে রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তাঁর। সুজাতার চিঠিটা পড়ার পর কণ্ঠস্বর চড়া পর্দায় তুলে এমন চিৎকার করতে থাকবেন যে এত বড় তিনতলা বাড়ির ভিত কেঁপে যাবে। বিধবা বৌদি ফের বিয়ে করতে চলেছে, তাঁর চেঁচামেচিতে 'দত্ত ম্যানসন'-এর ঠাকুর চাকর ড্রাইভার দারোয়ান, লহমায় সকলে জেনে যাবে। সোনা বাবুন বিনোদিনী, কারও জানতে বাকি থাকবে না। তখন ওদের মুখগুলি কতখানি হতাশ বিহ্বল এবং করুণ হয়ে উঠবে তার একটা ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে সুজাতার।

শ্যামা মেঝেতে থেবড়ে বসে অবিরল বকর বকর করে চলেছে। যেমনটা সে করে থাকে। তার একটি শব্দও সুজাতার কানে ঢুকছিল না। হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে ওঠে সে। অঞ্জন নেই। জীবনে পরমাশ্চর্য আরও একবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কে কী ভাববে, কে কী বলবে, কার কী প্রতিক্রিয়া হবে, এসব নিয়ে যদি নিজেকে গুটিয়ে রাখে, পরে হয়তো আক্ষেপের অবধি থাকবে না। যা করার আজই করবে সে। ব্রেকফাস্টের পর যে ব্যাঙ্কগুলোতে স্বর্ণলতা এবং নিশানাথের সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, লকারে তার নাম আছে, যে সব ইনভেস্টমেন্টে তাকে জড়ানো হয়েছে, সব জায়গায় চিঠি দিয়ে নিজের নাম কাটানো দরকার। চিঠিগুলো লিখে রাখবে সে। 'দত্ত ম্যানসন' থেকে যখন চলেই যেতে হবে, সবরকম সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলাই উচিত। বিভাসদের বাড়ি থেকে যখন স্বর্ণলতাদের চিঠি পাঠাবে, খামে এই চিঠিগুলো ভরে দেবে।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। শ্যামা ট্রেতে এঁটো কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে চলে গেছে। সুজাতা ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে। তাড়াহুড়ো নেই। ব্যাঙ্কে চিঠিগুলোর বয়ান কিরকম হবে, মনে মনে ঠিক করে নিতে লাগল সে।

হঠাৎ দোতলা থেকে তুমুল হইচই এবং ত্রস্ত ছোটাছুটির আওয়াজ উঠে আসে। ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক যে চকিত হয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে সুজাতা। আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর এমন কিছু তার মনে হয়নি যাতে এরকম কিছু ঘটতে পারে। বাড়িটা অন্য দিনের মতোই ছিল শান্ত। মাঝে মাঝে স্বর্ণলতার গলা ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছিল। তিনি খুব সম্ভব কাজের লোকদের কিছু বলছিলেন।

সুজাতা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কী ঘটতে পারে, আঁচ করা যাচ্ছে না। চোখে পড়ল, সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে শ্যামা আসছে। ভীষণ হাঁপাচ্ছে সে। ভয়ে চোখ দু'টো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। বলল, 'শিগ্‌গির চল বউদি। মা তোমারে ডাকতেচে—' সে স্বর্ণলতাকে মা বলে।

সুজাতা জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে রে?' তার চোখেমুখে উদ্বেগ ফুটে বেরোয়।

'ছোটদাদার মাথায় ফের খ্যাপামি চেগেচে। সমস্ত ভেঙে চুরে শ্যাষ কইরে ফেলতেচে। দেঁড়িয়ে থেকোনি। চল চল—'

ক'দিন আগে লক্ষণটা দেখা গিয়েছিল। তারপর মোটমুটি শান্তই ছিল বাবুন। কোনও রকম গোলমাল করেনি। নানা ব্যাপারে সুজাতা এতটাই জড়িয়ে পড়েছিল যে ওর কথা তেমন একটা খেয়াল ছিল না। মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। প্রথম যেদিন বাবুনের চোখেমুখে অস্বাভাবিক ভাবটা নজরে পড়েছিল তখনই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

ঝড়ের বেগে দোতলায় নেমে আসে সুজাতা। বারান্দায় কাজের লোকদের অনেককেই দেখা যাচ্ছে। কুঞ্জ, ব্রজ, রান্নার ঠাকুর জগন্নাথ, প্রায় সবাই। তারা হতচকিত, ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। কী করবে, ঠিক করতে না পেরে দিশেহারার মতো এধারে ওধারে দৌড়চ্ছে আর চেঁচিয়ে মেচিয়ে কী সব বলছে, তার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

সুজাতা বাবুনের ঘরের সামনে চলে এসেছিল। লক্ষ করল, তার চোখ টকটকে লাল। শরীরের সব রক্ত যেন সে দু'টোয় জমা হয়েছে। গলার কাছের শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে উঠেছে। অদ্ভুত এক হিংস্রতা ভর করেছে তার ওপর।

সারা ঘর লন্ডভন্ড। মেঝে জুড়ে অজস্র কাচের টুকরো ছড়ানো। ড্রেসিং

টেবল আর আলমারির গায়ে যে আয়না লাগানো ছিল সেগুলো চুরমার হয়ে গেছে। বোঝাই যায় বাবুন শক্ত কিছু ছুড়ে ছুড়ে ভেঙে ফেলেছে। ওয়ার্ডরোবের পাল্লাগুলো হাট করে খোলা। প্যান্ট শার্ট কোট গেঞ্জি, সব বার করে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেছে বাবুন। এখন ছিঁড়ছে বালিশ আর তোশকের ওয়াড়। তুলো উড়ছে ঘরময়। তার গলা থেকে গজরানির মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে। গালের কষ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

বাবুনের এভাবে হিংস্র উন্মাদ হয়ে ওঠাটা নতুন কিছু নয়। বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে বেশ কয়েকবার ওকে এরকম খেপে উঠতে দেখেছে সুজাতা। অঞ্জন যতদিন বেঁচে ছিল, সে নিজেই সব সামলাত। ডাক্তার নিরুপম ঘোষ পাগলদের নাম-করা ডাক্তার। তিনিই বাবুনের চিকিৎসা করে আসছেন। ঠাকুরপুকুর ছাড়িয়ে জোকায় যাবার রাস্তায় তাঁর একটা প্রাইভেট হাসপাতাল আছে। বাবুন ভায়োলেন্ট হয়ে উঠলে তাকে বেঁধে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বেশ কিছুদিন বাদে সুস্থ হয়ে উঠলে সে বাড়ি ফিরে আসে। অঞ্জনের মৃত্যুর পর এই দায়িত্বটা সুজাতাকে নিতে হয়েছে।

স্বর্ণলতা তাঁর ঘরের দরজার বাইরে যে চলে এসেছিলেন, খেয়াল করেনি সুজাতা। তাকে দেখে স্বর্ণলতা চিৎকার করতে লাগলেন, 'বৌমা, এক্ষুনি বাবুনকে ডাক্তার ঘোষের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। তার আগে কুঞ্জদের দিয়ে ওকে বেঁধে ফেলো।'

কুঞ্জদের দিয়ে সম্ভব হল না। ভয়ে তারা এগুতেই চায় না। অগত্যা নিচে থেকে দারোয়ান বিষুণ সিং আর ড্রাইভার হরিপদকে ডাকিয়ে এনে দড়ি দিয়ে বাবুনকে বেঁধে ফেলা হল। সুজাতাকেও ওদের সঙ্গে হাত লাগাতে হয়েছে। খ্যাপামি চাড়া দিলে ছেলেটার গায়ে দশটা হাতির শক্তি যেন ভর করে। সহজে কি তাকে কাবু করা যায়! বাঁধার আগে আঁচড়ে কামড়ে কিল ঘুষি চালিয়ে যতক্ষণ পেরেছে রুখবার চেষ্টা করেছে বাবুন।

অন্য বার যেমন করা হয়েছে, এবারও তেমনি বাঁধার পর বাড়ির গাড়িতে তুলে বাবুনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুজাতা। সঙ্গে রয়েছে কুঞ্জ আর ব্রজ। বাবুন যদি কোনও রকমে বাঁধনটা খুলে ফেলতে পারে, তাকে একা সামলাতে পারবে না সুজাতা। ড্রাইভার হরিপদ অবশ্য রয়েছে। কিন্তু সে রোগা পটকা, হাড়সর্বস্ব দুর্বল চেহারা তার। বাবুনের একটা লাথি বা ঘুষি খেলে দশ পাক ঘুরে ঠিকরে পড়ে যাবে। তাই ব্রজ আর কুঞ্জকে সঙ্গে নেওয়া।

গাড়ি এসপ্ল্যানেড থেকে ডান দিকে ঘুরে এখন রেড রোডে ঢুকে পড়েছে। সোজা খিদিরপুর হয়ে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরবে তারা।

সামনের সিটে হরিপদর পাশে বসে আছে সুজাতা। পেছনের সিটে মাঝখানে বাবুনকে রেখে তাকে পাহারা দিচ্ছে কুঞ্জরা।

বেলা বেড়ে গেছে অনেকখানি। দিনের তাপাঙ্ক তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়ছে।

বাঁ দিকে ময়দানের বিপুল বিস্তার। যত দূর চোখ যায়, ঘন সবুজ ঘাস আর বিশাল বিশাল সব বনস্পতি। ময়দান তার চিরকালের মহিমা নিয়ে ঝলমল করছে। বহুদূরে চৌরঙ্গির উঁচু উঁচু হাইরাইজগুলো আকাশে মাথা তুলে রয়েছে।

ময়দান চিরে চিরে যে-সব রাস্তা নানা দিকে ছুটে গেছে, আজ ছুটির দিন বলে সেগুলোতে গাড়িটাড়ি বা মানুযজন খুব কম।

চকিতের জন্য রজতাভর মুখটা চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সুজাতা মনস্থির করে ফেলেছিল, আজ দাদা-বৌদিকে ফোনে রজতাভর কথা বলবে। জানিয়ে দেবে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে তারা নোটিশ দিয়েছে। কাল লাঞ্চে বিভাসদের সঙ্গে পরিচয় হবে। তারপর অফিসের নাম করে বাইরে যাবার কথা বলে ওদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি চলে যাবে। সেখান থেকে চিঠি লিখে স্বর্ণলতাকে বিয়ের কথাটা জানাবে।

দ্বিধা কাটিয়ে সে যখন মোটামুটি প্রস্তুত, সেই সময় বাবুনের পুরনো পাগলামি ফের চাগাড় দিয়ে উঠল।

যা ভাবা গিয়েছিল তা এখন অসম্ভব। স্বর্ণলতার পেটের যন্ত্রণাটা ক'দিন কমে থাকার পর ফের চাড়া দিতে শুরু করেছে। তাঁর পক্ষে বাবুনের ব্যাপারে এখন কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। বাবুনকে কতদিন ডাক্তার ঘোষের হাসপাতালে থাকতে হবে, কে জানে। ভর্তি করে দিলেই তো হবে না। দু'চার দিন পর পর সেখানে ছোটাছুটিও করতে হবে। 'দত্ত ম্যানসন'-এ সুজাতা ছাড়া আর কে-ই বা আছে, এই দায়িত্বটা নিতে পারে?

না, সমস্ত পরিকল্পনা গোলমাল হয়ে গেল। কবে যে দাদা-বৌদি আর স্বর্ণলতাদের তার আর রজতাভর কথাটা জানাতে পারবে. কে জানে। গভীর হতাশায় মন ভরে যেতে থাকে সুজাতার।

দশ

ডাক্তার নিরুপম ঘোষের মানসিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্রটি ঠিক বড় রাস্তার ওপরে নয়। ডায়মন্ডহারবার রোড থেকে একটা সুরকি ঢালা পথ ডান দিকে বেশ খানিক দূর চলে গেছে। তার শেষ মাথায় হাসপাতালটা। নাম 'আরোগ্য ভবন'।

আগেও এখানে অনেকবার এসেছে সুজাতা। বিরাট কম্পাউন্ডের ভেতর গোলাপি রঙের তিনটে বাড়ি। দু'টো একতলা। মূল বিল্ডিংটা অনেক বড়—তেতলা। চারপাশে চমৎকার বাগান, ফুলফলের রকমারি গাছ। আছে বাঁধানো পুকুর। পুরো এলাকাটা ভারি শান্ত, নিরিবিলি। যেদিকে তাকানো যাক, সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কলকাতার এত কাছে, কিন্তু হইচই নেই। ধোঁয়া ধুলো শব্দদূষণ, সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত। মানসিক রোগীদের নিরাময়ের জন্য এর চেয়ে ভালো পরিবেশ আর কী হতে পারে?

এখানে আসার আগে ফোনে ডাক্তার ঘোষকে জানিয়ে দিয়েছিল সুজাতা। তিনি তাঁর চেম্বারে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'অমিত তো অনেকদিন ভালো ছিল। ভেবেছিলাম আর কোনও প্রবলেম হবে না। পুরোপুরি নর্মাল হয়ে যাবে। হঠাৎ রোগটা ফের—মানে, সাঙ্ঘাতিক উত্তেজনার কোনও কারণ কি ঘটেছিল?'

সুজাতা বলল, 'না। ও ওর মতো থাকত। চার বেলা ঠিক সময়ে খেত। মাঝে মাঝে ক্যাসেট চালিয়ে একটু আধটু গানও শুনত। বইটই পড়ত। আমাদের দেখলে গল্প টল্প করত। তবে নিজের ঘর থেকে খুব একটা বেরুত না। আপনার মতো আমরাও ভেবেছিলাম, ও নর্মাল হয়ে গেছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'রিসেন্টলি একদিন চোখে পড়ল ওর চোখমুখের চেহাবা কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।'

'এই চেঞ্জটা ঠিক কতদিন আগে দেখেছেন?'

একটু চিন্তা করে সুজাতা বলল, 'আট দশ দিন তো হবেই।'

ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'তখনই কিন্তু আমাকে জানানো উচিত ছিল।'

'ভেবেছিলাম ওই অবস্থাটা কেটে যাবে, ওটা একটা সাময়িক ব্যাপার।' বিব্রতভাবে বলল সুজাতা। নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হচ্ছিল তার।

ডাক্তার ঘোষ আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

বাবুনকে ভরতি করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তিনটে বেজে গেল। কিছু দরকারি ওষুধ হাসপাতালের ফার্মাসিতে ছিল না। ঠাকুরপুকুর থেকে কিনে দিয়ে এসেছে। আরও কিছু বাকি আছে। ওখানে পাওয়া যায়নি। কলকাতায় বড় কোনও ওষুধের দোকান থেকে কিনে দু-একদিনের ভেতর দিয়ে আসতে হবে। ডাক্তার ঘোষ বলছেন, এখন কিছুদিন রোজ সুজাতা যদি হাসপাতালে আসতে পারে, খুব ভালো হয়। একান্তই সেটা সম্ভব না হলে যেন তাঁকে ফোন করে। পেশেন্টের কখন কী প্রয়োজন হয়, তার বন্দোবস্ত তক্ষুনি করতে হবে।

বাড়ির সবাই, বিশেষ করে স্বর্ণলতা আর নিশানাথ তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বাবুনের জন্য হাসপাতালে কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, কতদিন তাকে ওখানে থাকতে হবে, ডাক্তার ঘোষ কী বললেন, খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু স্বর্ণলতা আর নিশানাথকে জানিয়ে তেতলার ঘরে চলে এল সুজাতা। হাত-মুখ ধুয়ে, জামাকাপড় পালটে, ঘরোয়া পোশাক পরে, বিছানায় শুয়ে পড়ল। সকাল থেকে প্রবল ঝড় তাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে যেন হাড়গোড় ভেঙে দিয়ে গেছে। হাত-পায়ের জোড় আলগা আলগা হয়ে আসছিল। ক্লান্তি, অসীম ক্লান্তি। শোবার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জুড়ে আসতে লাগল।

শ্যামা নজর রাখছিল। সে ঘরে এসে ভয়ে ভয়ে ডাকল, 'বৌদি—বৌদি—'

জড়ানো গলায় সুজাতা বলল, 'কী বলছিস?'

'তোমার তো দুকুরবেলায় কিচু খাওয়া হয়নি। ছোট দাদাবাবুকে নে (নিয়ে) ঝা (যা) হুজ্জোৎ গেল, খাবার সোমায় (সময়) আর ক্যামন করে পাবে? তোমার ভাত নে আসি?'

এই অবেলায় ভাত খেলে ভীষণ অস্বস্তি হয়। গা টিস টিস করে। সুজাতা বলল, 'না, আনতে হবে না। একদম খেতে ইচ্ছে করছে না।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! শ্যামা তাকে না খাইয়ে ছাড়তে চাইছে না। বলল, 'খালি পেটে থাকলি পিত্তি পড়বে গো বৌদি—'

মেয়েটা সত্যিই তাকে ভালোবাসে। সুজাতা নরম গলায় বলল, 'আর বকবক করিস না। আমাকে ঘুমোতে দে। যখন ঘুম ভাঙবে, কড়া করে দু'টো টোস্ট আর চা নিয়ে আসিস। রাত্তিরে ভাত খাব। এখন যা—'

শ্যামা চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল সুজাতা।

একটানা দু'তিন ঘন্টা ঘুমোতে পারলে ক্লান্তি কেটে যেত। শরীর ঝরঝরে লাগত। কিন্তু আজ তার উপায় নেই।

টেলিফোনের আওয়াজে আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল সুজাতার। শোবার সময় মাথার কাছে সেল ফোনটা রেখে দেয় সে। এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস। আজও রেখেছিল। সেটাই কুর কুর করে বেজে চলেছে।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। কখন সন্ধে নেমে গেছে টের পায়নি। বিছানা থেকে নেমে দেওয়ালের সুইচ টিপতেই চারদিক আলোয় ভরে গেল।

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বিরক্ত হচ্ছিল সুজাতা। বিছানায় ফিরে এসে ফোনটা তুলে 'অন' করতে করতেই 'কলার'-এর নাম্বারটা চোখে পড়ল। রজতাভ। চকিতে মনে পড়ল, আজ সন্ধের পর ওর ফোন করার কথা ছিল।

ওধার থেকে রজতাভর গলা ভেসে আসে, 'বল, তোমার দাদা-বৌদির প্রতিক্রিয়া কী হল।' তার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা কৌতূহল খুশি এবং সেই সঙ্গে কিছুটা শঙ্কাও মেশানো।

রজতাভ ধরেই নিয়েছে, সুজাতা বিয়ের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা অশোক আর পারমিতা, অর্থাৎ ওর দাদা-বৌদিকে জানিয়ে দিয়েছে। কত আশা করে আছে সে। কিন্তু কী উত্তর দেবে সুজাতা?

রজতাভর ধৈর্য খুব কম। সে তাড়া লাগায়, 'কী হল, কিছু বলছ না যে?'

ঢোক গিলে বিব্রতভাবে সুজাতা বলল, 'এ বাড়িতে আজ একটা ভীষণ বিপদ ঘটে গেছে।'

'বিপদ!' রজতাভ চমকে ওঠে, 'কী হয়েছে?'

বাবুনের হঠাৎ ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠা, তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ডাক্তার ঘোষের হাসপাতাল 'আরোগ্য ভবন'-এ ভর্তি করা—সমস্ত কিছু জানিয়ে সুজাতা বলল, 'এই কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছি। শরীর এত টায়ার্ড যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'দত্ত ম্যানসন'-এর মানুষগুলো সম্পর্কে সব তথ্য রজতাভর জানা। কিছুই গোপন করেনি সুজাতা। রজতাভ বলল, 'বাবুনের খ্যাপানিটা চাড়া দেবার আর সময় পেল না?'

সুজাতা উত্তর দিল না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রজতাভ জিগ্যেস করে, 'ওই অবস্থায় নিশ্চয়ই দাদা-বৌদিকে কথাটা বলতে পারনি।'

'তুমিই ভেবে দেখ, বলা কি সম্ভব ছিল?'

'না, ছিল না।' হতাশার স্তর ঠেলে ঠেলে রজতাভর কথাগুলো যেন বেরিয়ে এল।

সুজাতা বলল, 'ইন ফাক্ট দাদা-বৌদির কথা আমার খেয়ালই ছিল না। হাসপাতাল থেকে ফিরে এত ক্লান্তি লাগছিল যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সুজাতা দ্বিধাগ্রস্তের মতো জিগ্যেস করে, 'তুমি কি লাইনটা ছেড়ে দিয়েছ?'

রজতাভ বলল, 'না না, একটা কথা চিন্তা করছিলাম।'

'কী কথা?'

'কাল লাঞ্চে বিভাসদের ডেকেছি। রেস্তোরাঁয় টেবলও রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। বিভাসদের ইচ্ছে ছিল, ওখান থেকেই ওরা তোমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে। তারপর এই সপ্তাহেই কোনও একদিন ফাইনালি তুমি সেখানে গিয়ে উঠবে। টিল আওয়ার ম্যারেজ ওই বাড়িতেই থাকবে। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়াল তাতে 'দত্ত ম্যানসন' ছেড়ে খুব তাড়াতাড়ি তোমার পক্ষে বেরুনো ভীষণ মুশকিল—'

সুজাতা চুপ।

রজতাভ বলল, 'কালকের লাঞ্চের ব্যাপারটা কী হবে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। আমাকে কয়েকদিন ব্যাঙ্ক থেকে ছুটি নিয়ে বাবুনের জন্যে মেন্টাল অ্যাসাইলামে ছোটাছুটি করতে হবে। এই অবস্থায়, বুঝতেই পারছ—'

'ওটা ক্যানসেলই করে দিই।'

'না না, সেটা খুব খারাপ দেখাবে। তুমি ওদের কোম্পানি দিও।

'তাই কখনও হয়। যার জন্যে লাঞ্চ সে-ই থাকবে না। ইটস মিনিংলেস। বিভাসরা যখন জানবে তুমি আসছ না, ওরা কিছুতেই রাজি হবে না।'

সুজাতা কী জবাব দেবে যখন ঠিক করতে পারছে না, সেই সময় রজতাভ ফের বলে ওঠে, 'ও বাড়ির যা হাল তাতে আমাদের ব্যাপারটা আনসার্টেন হয়ে গেল।'

ঝাপসা গলায় সুজাতা বলে, 'হ্যাঁ। সব গোলমাল হয়ে গেছে—'

'ওইরকম একটা বিপদের মধ্যে ওদের ফেলে তোমার চলে আসাটা ইনহিউম্যান কাজ হবে।'

'এখন তা হলে কী করা?'

'আমার মাথায় কিছুই আসছে না।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর রজতাভ বলল, 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের যে নোটিশটা দেওয়া হয়েছিল সেটার সময় আর একটু বাড়িয়ে দেব?'

সুজাতা বলল, 'তা ছাড়া উপায়ই বা কী?'

'সব সামলে নিতে তোমার দিক থেকে কতদিন লাগতে পারে?'

'কী করে বলি? আজই তো সবে বাবুনকে ভর্তি করলাম। ডাক্তার ঘোষের কথা শুনে মনে হল, কেসটা সিরিয়াস। সারতে সময় লাগবে। ওকে সুস্থ করে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে এগুনো যাবে না।'

শুকনো গলায় রজতাভ বলল, 'আপাতত নোটিশের পিরিয়ডটা আরও মাস দেড়েক বাড়িয়ে দিই। তারপর দেখা যাক। এখন ছাড়ছি।'

লাইন কেটে দিল রজতাভ। তার আশাভঙ্গ, তার কষ্টটা অনুভব করতে পারছিল সুজাতা।

এগারো

সময় কেটে যাচ্ছে, তবে আগের মতো একই নিয়মে নয়। আগে শুধু অফিসের ঝক্কিটাই ছিল। তার সঙ্গে এখন মাথায় চেপেছে আরও অনেক দায়। দত্ত বংশের প্রায় আধ ডজন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, শেয়ার, বন্ড, নানা মিউচুয়াল ফান্ডের হিসেব নিকেশ তাকেই সামলাতে হচ্ছে। স্বর্ণলতার শরীর যেভাবে ভেঙে যাচ্ছে, নিজেদের বেডরুম থেকে প্রায় বেরোনই না। অকারণে তাঁরা ব্যাঙ্ক আর শেয়ার-টেয়ারে সুজাতার নাম জুড়ে দেননি।

এ তো গেল একটা দিক। বাবুনকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর প্রথম প্রথম প্রায় রোজই সুজাতাকে সেখানে দৌড়তে হয়েছে। এখন বাবুন সামান্য ভালোর দিকে। তবু সপ্তাহে দু'দিন যেতেই হয়।

রজতাভ আগে যেমন তার অফিসে আসত, এখনও তাই আসে। উইকে দু'তিন দিন। লাঞ্চব্রেকের সময় বা ছুটির পর ওর সঙ্গে ঘন্টাখানেক কোনও রেস্তোরাঁয় কাটিয়ে যায়। রজতাভ যখনই আসে, একই ধরনের প্রশ্ন করে। 'দত্ত ম্যানসন'-এর পরিস্থিতি এখন কেমন, বাবুনের কতটা ইমপ্রুভমেন্ট হল, ইত্যাদি। সুজাতা একই উত্তর দিয়ে যায়। শুনতে শুনতে মুখ কালো হয়ে ওঠে রজতাভর।

রোজ দেখা না হলেও, রোজ রাত্তিরে ফোনে কথা হয়। তখনও একই প্রশ্ন, একই উত্তর।

একদিন লাঞ্চ আওয়ার্সের পর অফিসে ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল সুজাতা। রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ফোন করে বলে, 'ম্যাডাম, দেবযানী দত্ত নামে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। পাঠিয়ে দেব?'

নামটা ভালো করে খেয়াল করেনি সুজাতা। অন্যমনস্কর মতো বলল, 'পাঠিয়ে দাও—'

একটু পরেই কাচের দরজা ঠেলে যে ঢুকল তাকে দেখে সুজাতা অবাক। সোনা এবং তার সঙ্গে একটি ঝকঝকে চেহারার যুবক। বয়স খুব বেশি হলে চব্বিশ কি পঁচিশ।

সোনা এর আগে তার অফিসে আসেনি। হুট করে কোনও দিন যে হাজির হবে, ভাবেওনি সুজাতা। চমকটা সেই কারণে। বলল, 'তুই!'

'হ্যাঁ, আমি।' লাজুক হেসে সোনা বলল, 'কেমন একটা সারপ্রাইজ দিলাম বল তো বৌদি—'

'তা দিয়েছিস। ব'স।'

ওরা বসলে সুজাতার চোখ সোনার সঙ্গী যুবকটির দিকে চলে গেল। মাথার ভেতর একটা কম্পিউটার এর মধ্যে চালু হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে সোনার মুখে কী একটা নাম যেন শুনেছিল? মনে পড়ছে সারনেমটা—পাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ -- রাজশেখর পাই। টেবলের ওধারে সোনার পাশে যে এই মুহূর্তে বসে আছে সে অবশ্যই রাজশেখর।

সুজাতার চোখ আবার সোনার দিকে ফিরে আসে। বলল, 'কলেজ পালিয়ে আমার অফিসে হানা দিয়েছিস যে? কী ব্যাপার?'

সোনা হকচকিয়ে যায়। হাত এবং মাথা প্রবলভাবে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'না না, কলেজ পালাইনি। আজ একজন প্রফেসর অসুস্থ, লাস্ট পিরিয়ডটা হয়নি। তাই—'

সুজাতা এবার সোজাসুজি রাজশেখরকে জিগ্যেস করে, 'ওর না হয় প্রফেসর অসুস্থ! তুমি অফিস পালিয়েছ যে?'

রাজশেখর থতমত খেয়ে যায়। তো তো করে বলে, 'আমি—আমি—'

'হ্যাঁ, তুমি। ভেবেছ, আগে দেখিনি বলে তোমাকে চিনতে পারব না?'

এদিকে সোনা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। সুজাতাকে রাজশেখরের কথা একবারই শুধু বলেছিল সে। সেটা সুজাতা মনে তো করে রেখেছেই, প্রবল অনুমানশক্তিতে তার সঙ্গীটিকে চিনেও ফেলেছে। বলল, 'তুমি জানলে কী করে? আমি তো এখনও পরিচয় করিয়ে দিইনি!'

সুজাতা বলল, 'সারপ্রাইজটা শুধু তুই-ই দিতে পারিস! আমি পারি না?'

সোনা হাসতে লাগল।

সুজাতা বেয়ারাকে ডেকে কফি কাজুবাদাম আর সন্দেশ আনিয়ে জিগ্যেস করল, 'দু'জনের দেখা হল কী করে? মাঝে মাঝেই কি কলেজ আর অফিস পালানো হয়?'

সোনা আর রাজশেখর দু'জনেই ভীষণ হকচকিয়ে যায়। সোনা হাত এবং মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'না বৌদি, মোটেও না। আজই প্রথম। আমার কাছে রাজু তোমার কথা এত শুনেছে যে দেখা করার জন্যে খেপে উঠেছিল। তাই—'

রাজু যে রাজশেখর, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুজাতা ভুরু কুঁচকে রাজশেখরকে জিগ্যেস করে, 'তোমার অফিস কোথায়?'

রাজশেখর হয়তো একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। নিচু গলায় বলল, 'ডালহৌসিতে—'

'তোমার অফিস ডালহৌসিতে, সোনার কলেজ কলেজ স্ট্রিটে। এই যে আমার এখানে এলে, দু'জনের যোগাযোগটা হল কীভাবে?'

ঢোক গিলে রাজশেখর জানায় ফোনে আগেই তারা ঠিক করে নিয়েছিল, এসপ্লানেডে মেট্রো স্টেশনের সামনে দেখা করবে। কলেজ থেকে সোনা চলে আসবে সেখানে। রাজশেখর আসবে তার অফিস থেকে। সেই মতো এসে ট্যাক্সি ধরে সুজাতার ব্যাঙ্কে হাজির হয়েছে।

পরিষ্কার ঝরঝরে বাংলায় কথা বলছে রাজশেখর। কোনও রকম জড়তা নেই। নির্ভুল উচ্চারণ। ও যে বাঙালি নয়, না জানলে বোঝার উপায় নেই।

ভুরু এখনও কুঁচকেই আছে সুজাতার। বলল, 'আই সী—'

সোনা পুরনো প্রশ্নটা ফের করল, 'বৌদি, বললে না তো ওকে চিনলে কী করে?'

সুজাতা বলল, 'এর জন্যে যথেষ্ট বুদ্ধির দরকার নেই। ওনলি কমনসেন্স মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি। তোর সঙ্গে রাজশেখর ছাড়া আর কার পক্ষেই বা আসা সম্ভব?' বলতে বলতে তার চোখ আবার রাজশেখরের মুখের ওপর স্থির হল। হয়তো একটু মজা করতে ইচ্ছা হচ্ছে, তাই লঘু সুরে বলল, 'তারপর রাজশেখর পাই, বাচ্চা মেয়ে পেয়ে আমার ননদটির মাথা খেয়ে যাচ্ছ, কেমন?'

প্রথম দিকে একটু নার্ভাস ছিল রাজশেখর। সেই ভাবটা কাটিয়ে উঠে এবার বেশ সাহসী হয়ে ওঠে। তার ঠোঁটে হাসির চিকন একটি রেখা ফুটে বেরোয়। মুখ নামিয়ে সে বলে, 'কে যে কার মাথা খাচ্ছে, বলা মুশকিল।'

'ফাইন, ফাইন।' রাজশেখরের জবাবে খুশিই হয়েছে সুজাতা। ছেলেটা মজার বদলে পালটা মজা করতে জানে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'দারুণ বলেছ। এনিওয়ে, হঠাৎ আমার কাছে কী মনে করে?'

এবার গলার স্বরটা মিনমিনে হয়ে যায় রাজশেখরের, 'আপনি যেন কিছুই বুঝতে পারেননি!'

মাথাটা ধীরে ধীরে দোলাতে দোলাতে সুজাতা বলে, 'পারিনি যে তা নয়। শুনেছি তোমাদের ফ্যামিলিতে ইন্টার-প্রভিন্সিয়াল ম্যারেজ অনেক হয়েছে। তবে বাঙালিদের সঙ্গে কোন বিয়ে-টিয়ে হয়নি। সেটা হলে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের ছোটখাটো একা মডেল তৈরি হয়ে যায়। গুড, ভেরি গুড। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'সোনাকে আমি বলেছি, এখনও তার পড়াশোনা শেষ হয়নি। শুনেছি, অফিসে তুমি পার্মানেন্ট হওনি। এই অবস্থায়--'

'আমরা এক্ষুনি কিছু চাইছি না। দু'বছর হোক, তিন বছর হোক, ওয়েট করব। কিন্তু—'

'কী?'

'দেবযানী বলেছে, ওর মা ভীষণ রাগী মানুষ।

মোটামুটি এ ধরনের কথা দেবযানী, অর্থাৎ সোনার সঙ্গে আগেই হয়েছে সুজাতার। চোখ গোল করে ভয়ের ভঙ্গি করল সে। রাজশেখরকে ভড়কে দেবার জন্য বলল, 'ঠিকই বলেছে। রেগে গেলে মাথায় রক্ত চড়ে যায় আমার শাশুড়ির। লেফটেনান্ট কর্নেলের মেয়ে তো। বাবার মিলিটারি মেজাজের অনেকটাই পেয়েছেন আমার শাশুড়ি। তার ওপর ভীষণ কনজারভেটিভ। সেকেলে ধ্যানধারণা নিয়ে বসে আছেন।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'তুমি কি আরেকটা কথা জানো?'

'কী?'

'বাড়ির ছেলেমেয়েরা প্রেম করে বিয়ে করলে একেবারে খুন করে ফেলবেন আমার শাশুড়ি। জাতি গোত্র কুলশীল মিলিয়ে তবেই বিয়েতে পারমিশন দেন। তার ওপর বাড়ির মেয়ে বা ছেলে যদি নন-বেঙ্গলির সঙ্গে প্রেম করে বসে তার কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে ভেবে দেখ --'

একেবারে মিইয়ে যায় রাজশেখর। শুকনো গলায় বলে, 'দেবযানী বলেছে ওর দিদি একটি ইউ পি'র ছেলেকে বিয়ে করেছে।'

'সেই বিয়ের রেজাল্ট কী হয়েছে, সোনা তোমাকে কি জানিয়েছে? জয়ন্তী, মানে ওর দিদির সামনে চিরকালের মতো বাপের বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। বড় মেয়ের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখেননি আমার শাশুড়ি। তাঁর ভয়ে 'দত্ত ম্যানসন'-এ কেউ জয়ন্তীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না। সোনার বেলাতেও তেমনটা হোক, তুমি কি তা চাও?'

মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল রাজশেখরের। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলে, 'বৌদি, আমি কিচ্ছু জানি না। আপনার শরণ নিলাম। যেমন করে পারেন দেবযানীর মাকে রাজি করাবেন। লুকিয়ে চুরিয়ে বা পালিয়ে গিয়ে আমরা কিছু করতে চাই না। জীবনে সুখী হতে হলে মা-বাবার আশীর্বাদটা দরকার।'

সুজাতা লক্ষ করল, এই প্রথম তাকে বৌদি বলেছে রাজশেখর। সোনাব বৌদি, তাই সে ওরও বৌদি। ছেলেটাকে খুব ভালো লেগে যায় সুজাতার। ভারি নম্র, ভদ্র। লেশমাত্র উগ্রতা নেই। একটা মেয়েকে ভালোবেসেছি, তাকে যেভাবে পারি দখল করব, বাধা এলে ভেঙে চুরমার করে ফেলব, এমনটা সে ভাবেই না। মা-বাবার অমতে, তাঁদের কষ্ট দিয়ে নয়, তাঁরা হাসিমুখে মেয়েকে তার হাতে তুলে দেবেন, এটাই রাজশেখরের কাম্য। একটা প্রাপ্তির জন্য বিরাট কিছু হারাক, মোটেও সে তা চায় না। সবাইকে জড়িয়ে আনন্দে, খুশিতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়।

বিচিত্র এক আবেগ সুজাতার ওপর যেন ভর করে। গভীর গলায় সে বলে, 'এটাই তো হওয়া উচিত। তোমার কথা শুনে খুব ভালো লাগল।' একটু ভেবে ফের বলল, 'নিশ্চয়ই তোমাদের কথা মাকে বলব। চেষ্টা করব, উনি যাতে রাজি হন। তবে এখন নয়। তোমার চাকরি পার্মানেন্ট হোক, সোনা গ্র্যাজুয়েশনের পর এম. এ'টা কমপ্লিট করুক। তার চেয়েও বড় কথা শাশুড়ি-মা অসুস্থ। তিনি সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর—' এমন ভরসা সোনাকেও দিয়েছিল সে।

শশব্যস্তে রাজশেখর বলে ওঠে, 'না না, আপনি যখন ভালো বুঝবেন তখন বলবেন—'

সুজাতা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের যে দু'নম্বর নোটিশটা সে দিয়েছে তার ষোল দিন কেটে গেছে। পুরো একটা মাসও তার হাতে নেই। তারপর 'দত্ত ম্যানসন' ছেড়ে দূরে চলে যাবে। এই শহরেরই আরেক প্রান্তে থাকবে, কিন্তু দত্তদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আগেও যে সুজাতা এমনটা ভাবেনি তা নয়। নতুন করে তা খেয়াল হতে মন ভারী হয়ে যায়।

টেবলের উলটো দিকে দুই যুবক যুবতীর দিকে তাকায় সুজাতা। বিপুল আশায়, অপার খুশিতে দু'টো মুখ আলো হয়ে আছে। তাদের হতাশ করতে ইচ্ছা হল না। মনে হল, বিয়েটা হলে ওরা সুখী হবে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চঞ্চল হয়ে ওঠে সুজাতা। কখন যে অজান্তে পুরো একটি ঘন্টা কেটে গেছে, খেয়াল ছিল না। সে তাড়া দিয়ে রাজশেখরকে বলে, 'সোনা একবার ঘ্যান ঘ্যান করে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে। এবার তোমাকে টেনে এনেছে।'

সোনা তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানায়, 'না না, আমি না। ও-ই তো আসার জন্যে আমার মাথা খেয়ে ফেলছিল। তোমার চেম্বারে ঢুকেই বললাম না—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, দু'জনেই দু'জনকে টেনে এনেছ। এখন সরে পড়। প্রচুর কাজ জমে আছে। আর কথা বলার সময় নেই। সোনা, বেশি চরে বেড়িও না। সন্ধের আগে আগেই বাড়ি চলে যাবি। ছুটির পর আমি যদি গিয়ে দেখি, ফিরিসনি, এই বিয়েটা যাতে না হয় তার সব বন্দোবস্ত করব।'

তটস্থ সোনা বলল, 'না না, তুমি গিয়ে আমাকে ঠিক দেখতে পাবে।'

এবার কড়া চোখে রাজশেখরের দিকে তাকায় সুজাতা। 'রাজু, তোমার প্রেমিকাটিকে আটকে রাখার চেষ্টা করবে না। এখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে সোজা ওকে বাসে তুলে দেবে। ও. কে?'

দু'জনে উঠে পড়ে। মাথায় ঝাঁকি দিতে দিতে সচকিত ভঙ্গিতে সোনা জানায়, সুজাতার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করা হবে।

রাজশেখর অবশ্য ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমি যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে দেখা করি, রাগ করবেন?'

সুজাতার চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। সে বলে, 'রাজু, দিস ইজ অফিস। গল্প করার জায়গা নয়। এখানে এসে আমাকে খোশামুদি করার দরকার নেই। তোমাদের যা বলেছি, সেটা করলেই খুশি হব। ও. কে?'

কামরা থেকে দু'জনে বেরিয়ে যায়। কিন্তু একটু পরেই সোনা একাই ফিরে আসে।

রীতিমতো অবাক হয় সুজাতা, 'কী রে, আবার এলি যে! কিছু বলবি?'

সোনা ঘাড় কাত করে, 'হ্যাঁ। রাজুকে তো তুমি দেখলে। কী মনে হল?'

সোনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারে না সুজাতা। একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকে। বলে, 'মানে?'

'সোনা বলে, আমি কি ভুল করেছি বৌদি?'

জবাব দিতে গিয়ে লহমার জন্য থতিয়ে যায় সুজাতা। রাজশেখরের ব্যাপারে সোনার মনে কি দ্বিধা আছে? সে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা নির্ভুল কিনা তার কাছ থেকে তাই জেনে নিতে চাইছে?

রাজশেখরকে আজই প্রথম দেখল সুজাতা। ব্যাঙ্কে কাজ করার ফলে রোজ কত ধরনের লোকজন যে তার কাছে আসে! দেখামাত্র বেশির ভাগ মানুষের ভেতরটা আয়নার মতো সে পরিষ্কার দেখতে পায়। বুঝতে পারে কে ভালো, কে মন্দ, কে ধড়িবাজ, কে ধূর্ত। কিন্তু রাজশেখরকে দেখে মনেই হয় না তার মধ্যে কোনও রকম চাতুরি আছে বা অভিসন্ধি লুকিয়ে রেখে সে ভালোমানুষির মুখোশ এঁটে রেখেছে। ভারি নিষ্পাপ আর সরল মুখ। সোনার কথায় মনে যে কুয়াশা দেখা দিয়েছিল, ধীরে ধীরে তা সরে যায়। না, সোনার ভুল হয়নি। তার মধ্যে কোথাও সংশয়ের লেশমাত্র যদি থেকে থাকে, তুড়ি মেরে সেটা উড়িয়ে দিল সুজাতা। খুব আন্তরিক সুরে বলল, 'নো নো, নট অ্যাট অল। যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে হি ইজ অ ভেরি সুটেবল বয়, সৎপাত্র। জেম অফ আ বয়। একদিন ওদের বাড়ি নিয়ে যাস। ওর মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করব। আমার ধারণা ফ্যামিলিটা ভালোই হবে। তবু নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'বৌদি, ইউ আর গ্রেট—' উড়তে উড়তে চলে গেল সোনা। সুজাতা যে তার পছন্দ এবং সিদ্ধান্তকে দরাজভাবে মেনে নিয়েছে, তাতে তার খুশির সীমা পরিসীমা নেই।

বারো

সময়ের ভাঁজে ভাঁজে কত যে চমক লুকিয়ে থাকে। নোটিশের দেড় মাস সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আর মোটে চোদ্দ দিন বাকি। এর মধ্যে একদিন লাঞ্চে বিভাসদের ডেকে সুজাতার সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিয়েছে রজতাভ। বৌভাতের জন্য দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বড় বাড়িও 'বুক' করা হয়ে গেছে। একটা নাম-করা কেটারারকে অ্যাডভান্স করেছে সে। কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের দিন যত এগিয়ে আসছিল ততই উৎকণ্ঠায় মন ভরে যাচ্ছিল সুজাতার। এদিকে বিভাসদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে যাবার জন্য সমানে তাড়া দিয়ে যাচ্ছে রজতাভ। ব্যাপারটা আর ফেলে রাখতে চায় না সে। ফের 'দত্ত ম্যানসন'-এ কোন নতুন সংকট হাজির হবে, সে জন্যই তার এই ব্যস্ততা।

রজতাভ যা করছে, সবই ঠিক। কিন্তু 'যাই', 'যাব' করে করে যাওয়াটা হয়ে উঠছে না সুজাতার। ফলে রজতাভ বিরক্ত হচ্ছিল। হতাশায়, ক্ষোভে, উত্তেজনায় অস্থির অস্থির দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু 'দত্ত ম্যানসন' থেকে চিরকালের মতো বেরুবার মতো সংকল্প বা মানসিক শক্তি নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিল না সুজাতা। শেষ পর্যন্ত হয়তো রজতাভর প্রবল ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হত, কিন্তু তার আগেই ফের সব গোলমাল হয়ে গেল।

সেদিনও অফিসে বসে কাজে ডুবে ছিল সুজাতা। হইচই এবং ছোটাছুটির আওয়াজে চমকে মুখ তোলে।

চোখে পড়ল, বাইরে করিডর দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে আসছে জয়ন্তী। তাকে ঠেকাবার জন্য ধাওয়া করেছে রিসেপশানিস্ট মেয়েটি—লিজা, আর দু'টো উর্দি-পরা বেয়ারা। তারা সমানে চেঁচাচ্ছে। 'রুখো—রুখো—'

জয়ন্তীর পরনে আধময়লা সালোয়ার কামিজ, ওড়না মেঝেতে লুটোচ্ছে। উষ্কখুষ্ক চুল উড়ছে।

জয়ন্তী ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড়। প্রথমে সে, তারপর একে একে অঞ্জন বাবুন এবং সোনা। সুজাতা 'দত্ত ম্যানসন'-এ আসার আগেই সে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে চলে যায়। তারপর থেকে বাপের বাড়িতে তার প্রবেশ নিষেধ।

ফ্যামিলি অ্যালবামে জয়ন্তীর ছবি দেখলেও সামনাসামনি মাত্র একবারই তাকে দেখেছে সুজাতা। বছর দুই আগে সে এই অফিসে এসেছিল।

কাচের দরজা ঠেলে এর মধ্যে সুজাতার কামরায় ঢুকে পড়েছে জয়ন্তী। দুটো বেয়ারা এবং রিসেপশানিস্ট লিজা ভীষণ উত্তেজিত, সন্ত্রস্তও। তারা জানে আগে থেকে খবর না দিয়ে সুজাতার কামরায় ঢুকলে সে ভীষণ রেগে যায়। লিজারা জয়ন্তীকে বার করে নিয়ে যাবার জন্য টানা হ্যাঁচড়া করতে থাকে। ওরা তো জানে না, জয়ন্তীর সঙ্গে তাদের অফিসারটির সম্পর্ক কী।

রুষ্ট মুখে সুজাতা বলে, 'স্টপ ইট—'

লিজারা কাঁচুমাচু মুখে জানায়, জয়ন্তীর চেহারা, জামাকাপড়ের হাল দেখে ভেতরে আসতে দিতে চায়নি, কিন্তু সে জোর করে চলে এসেছে। কিছুতেই মহিলাটিকে ঠেকানো যায়নি। এরকম একটা বিশ্রী অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য ম্যাডাম যেন তাদের ক্ষমা করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুজাতা হাত নেড়ে লিজাদের চলে যেতে বলে উঠে এসে জয়ন্তীকে তার সামনের চেয়ারে বসায়। তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে বসে।

অ্যালবামের ফোটোতে কিংবা দু'বছর আগে যে জয়ন্তীকে সে দেখেছে তাকে এখন আর চেনাই যায় না। ভাঙাচোরা শীর্ণ মুখ, চোখের কোলে কালি, চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠ। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছিল সে। দু'বছর আগে কী সুন্দরই না ছিল! টেবলের ওধারে যে রমণীটি বসে আছে সে আগেকার জয়ন্তীর ধ্বংসস্তূপ।

জয়ন্তী যে এভাবে চলে আসতে পারে, ভাবা যায়নি। সুজাতা প্রথমটা হতবাক হয়ে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে প্রবল এক উদ্বেগ তার মধ্যে চারিয়ে যেতে থাকে। দম-আটকানো গলায় জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে দিদি?'

'রাহুলদের ওখানে আর থাকা গেল না। আমার ওপর যা টরচার চলছে, বলে বোঝাতে পারব না। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে জয়ন্তী।

স্বর্ণলতাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ইউ পি'র যে ছেলেটিকে জয়ন্তী বিয়ে করেছিল তার নাম রাহুল—রাহুল শ্রীবাস্তব। বিয়েটা যে সুখের হয়নি, সুজাতা তা অনেকদিন আগে থেকেই জানে। অবিরল গালাগাল, অপমান, মারধর। অত্যাচারটা কোন পর্যায়ে পৌঁছলে জয়ন্তী এভাবে ছুটে আসতে পারে সেটা না বোঝার কারণ নেই।

বিয়ের পর 'দত্ত ম্যানসন'-এ এসে জয়ন্তীর কথা যখন প্রথম শোনে, তখন থেকেই তার প্রতি সুজাতার অপার সহানুভূতি। বিভোর তরুণীটির একদিন হয়তো মনে হয়েছিল, সমস্ত বাধা সরিয়ে রাহুলের হাত ধরে স্বপ্নের উড়ানে সে বেরিয়ে পড়েছে। কে জানত, যেখানে সে পৌঁছেছে সেটা এক বধ্যভূমি।

বছর দুই আগে যখন জয়ন্তী ব্যাঙ্কে দেখা করতে এসেছিল, তখনই জানিয়েছে, বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য তার ওপর রাহুলরা চাপ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জয়ন্তীর পক্ষে 'দত্ত ম্যানসন'-এ যাওয়া অসম্ভব। স্বর্ণলতারা যদি সমস্ত শুনে মেয়ের নিরাপত্তার জন্য টাকা দিতে রাজিও হতেন, সেই টাকা সে কিছুতেই নিত না। যাঁরা তার বিয়েটাই মেনে নেন নি তাদের টাকা কোন মুখে নেবে সে? সুজাতা নিজের টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু জয়ন্তীর আত্মসম্মান বোধ প্রবল। সে কোনওভাবেই ছোট ভাইয়ের বৌ-এর কাছ থেকে টাকা নেবে না। সুজাতা বলল, 'কেঁদো না দিদি, কেঁদো না—'

'মা আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। রাহুলদের বাড়িতে আমি আর ফিরে যাব না। দিনরাত টাকা টাকা করে আমাকে পাগল করে ছাড়ছে। খেতে দেয় না,

ঘুমোতে দেয় না, সারাক্ষণ টরচার। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।' কান্নায় গলা বুজে আসতে লাগল জয়ন্তীর, 'ছেলে দু'টোকেও ওরা আটকে রাখল। আমাকে দেবে না।'

জয়ন্তীর দুই ছেলে— শানু আর ববি। শানুর বয়স সাত, ববির পাঁচ। হঠাৎ অদম্য এক জেদ মাথায় চেপে বসে সুজাতার। বলে, 'চল আমার সঙ্গে—'

মুখ থেকে হাত সরায় জয়ন্তী। চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে যাচ্ছে। ধরা ধরা, ভাঙা গলায় জিগ্যেস করে, 'কোথায়?'

'বাড়িতে।'

বিহ্বলের মতো জয়ন্তী বলে, 'কিন্তু মা—'

সুজাতা বলল, 'সেটা আমি দেখব। তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না।'

ম্যানেজারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে জয়ন্তীকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল সুজাতা।

বাড়িতে ফিরে সোজা দু'জনে স্বর্ণলতার কাছে চলে এল।

মাঝখানে ক'টা দিন পেটের যন্ত্রণাটা বেড়ে গিয়েছিল স্বর্ণলতার। আজ অনেকটা ভালো আছেন। জয়ন্তীকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। চোখমুখ থেকে আগুন ঝরতে থাকে। চিৎকার করে বললেন, 'কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে? জানো না, এ বাড়ির দরজা একবার বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে ঢোকা যায় না?'

মূহ্যমানের মতো বসে আছে জয়ন্তী। তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে।

সুজাতা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'মা, দিদি আসতে চায়নি। আমিই জোর করে নিয়ে এসেছি। কেন এনেছি, সবটা আগে শুনুন। তারপর রাগারাগি করবেন।' এক নিশ্বাসে জয়ন্তীর শ্বশুরবাড়ির ঘটনাটা জানিয়ে দেয় সে, 'দিদি আত্মহত্যা করুক, তা-ই কি আপনি চান?'

কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকেন স্বর্ণলতা। আন্দাজ করা যায়, তাঁর ভেতর তুমুল ওলটপালট চলছে। আচমকা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কেঁদে ফেলেন। গাঢ় আবেগে ঝাপসা গলায় বলেন, 'ওরা তোকে এত কষ্ট দিয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি মা। আগে জানলে কখনই এটা হত না। নিজের রাগ আর জেদ নিয়েই শুধু থেকেছি।' একটু শান্ত হয়ে সুজাতাকে বললেন, 'বউমা, আমাদের ল'ইয়ার মিস্টার বোসের সঙ্গে কাল-পরশুর মধ্যে দেখা কর। ওই

জানোয়ার ছোকরা রাহুল আর তার ফ্যামিলিকে আমি ছাড়ব না। ডিভোর্স কেস তো বটেই, কমপেনসেশন, জয়ীর দুই ছেলের কাস্টডির জন্যেও মামলা করতে হবে। তা ছাড়া. আমি চাই বছরের পর বছর মেয়েটার ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, সেজন্যে ওদের পানিশমেন্ট হোক। অন্তত তিন-চার বছর জেলের ঘানি ঘোরাক। বৌমা, তোমাকেই এটা দেখতে হবে।'

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর রজতাভকে ফোন করে নতুন পারিবারিক সংকটের কথা জানিয়ে দিল সুজাতা। এখন তাকে বেশ কিছুদিন জয়ন্তীর কেস নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। তা ছাড়া অন্য সব সমস্যা তো রয়েছেই।

অন্য প্রান্ত থেকে রজতাভর বিমর্ষ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। 'তার মানে বিয়ের নোটিশটা ক্যানসেল করে ফের আর একটা ডেট নিতে হবে, তাই তো?'

রজতাভর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল। সুজাতা আবছা গলায় বলে, 'হ্যাঁ।'

'নতুন ডেটটা কতদিন পর?'

'তিন চার মাসের আগে সব সামলে নিতে পারব বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, চার মাস পরের একটা ডেটই নেব। আশায় থাকা যাক।'

লাইন কেটে দিল রজতাভ।

তেরো

স্বর্ণলতাদের পারিবারিক ল'ইয়ার ইন্দ্রনাথ বোস। বহুকাল ধরে তিনি 'দত্ত ম্যানসন'-এর আইন আদালতের যাবতীয় ঝক্কি সামলে আসছেন। ইন্দ্রনাথের আগে তাঁর বাবা দত্তদের মামলা টামলার দিকটা দেখতেন। দত্ত এবং বোসেদের মধ্যে দুই জেনারেশন ধরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

জয়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে ইন্দ্রনাথদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে দেখা করল সুজাতা।

জয়ন্তীর অসুখী বিবাহিত জীবনের কথা মোটামুটি শুনেছিলেন ইন্দ্রনাথ। সুজাতা তাঁকে বিশদভাবে সব বলে তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যটা জানাল।

আইনজীবীরা এমনিতে খানিকটা নিরাসক্ত থাকেন। মানুষের এত অজস্র ধরনের জটিল সমস্যা তাঁদের রোজ ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় যে আবেগে ভাসলে চলে না। কিন্তু জয়ন্তীর কথা শোনার পর তাঁকে রীতিমতো বিচলিত দেখায়।

বললেন, তোমরা জয়ন্তীর ডিভোর্স, দুই ছেলের কাস্টডি, ওর ওপর টরচারের জন্যে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের পানিশমেন্ট চাইছ। এসব অবশ্যই হবে। এমন শিক্ষার ব্যবস্থা আমি করব, বাকি জীবন ওরা এভরি মোমেন্ট টের পাবে। এর জন্যে আমার কিছু জিনিস দরকার। নইলে কেস সাজানো সাজানো যাবে না।'

সুজাতা বলে, 'কী চাই বলুন—'

'প্রথমত, কিছু ডকুমেন্ট। জয়ন্তীর রেজিস্ট্রেশন ম্যারেজের সার্টিফেকেট, ওর ছেলেদের বার্থ সার্টিফিকেট ছাড়া আরও অনেক কিছু। তার একটা লিস্ট করে দেব। দু-তিন দিন বাদে এসে নিয়ে যেও।'

'আচ্ছা—'

'জয়ন্তীর ওপর যে টরচার হয়েছে তার কিছু সাক্ষীও চাই। সেরকম উইটনেস কি জোগাড় করা যাবে?'

এই প্রশ্নটার জবাব জয়ন্তীই দিল। সে জানায়, তার শ্বশুরবাড়িতে একটি কাজের মেয়ে লক্ষ্মীকান্তপুরে থাকে। সকালের ট্রেনে এসে সারাদিন কাজ করে সন্ধের আগে আগে ফিরে যায়। নাম সরস্বতী। জয়ন্তী তাদের ঠিকানা জানে। মেয়েটা খুব ভালো। জয়ন্তীর ওপর যে অত্যাচার চালানো হত, তাতে ভীষণ কষ্ট পেত সরস্বতী। অনেকবার সে তাকে ও বাড়ি থেকে চাল যেতে বলেছে। বলেছে, জয়ন্তী যদি শ্বশুরবাড়ি না ছাড়ে, রাহুলরা তাকে খুন করে ফেলবে।

সরস্বতী খুবই তেজী মেয়ে। সাহসী। জয়ন্তীকে সে ভালোবাসে। কোর্টে কেস উঠলে সে নিশ্চয়ই সাক্ষী দেবে। তা ছাড়া, জয়ন্তীর প্রতিবেশীদের অনেকেই তার নির্যাতনের ব্যাপারটা জানে। কেউ কেউ এসে রাহুলদের শাসিয়েও গেছে কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। ওদের আদালতে নিশ্চয়ই সাক্ষী হিসেবে পাওয়া যাবে।

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'ওদের নাম-ঠিকানাও আমাকে দিও। তার আগে ওদের সঙ্গে কথা বলে নিও, সত্যি সত্যি ওরা কোর্টে হাজির হতে রাজি কিনা—'

জয়ন্তী বলল, 'নিশ্চয়ই রাজি হবে।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'দেখ, কোর্টের নাম শুনলে অনেকে ঘাবড়ে যায়। তাই আগে থেকে সিওর হয়ে নেওয়াটা দরকার। তা ছাড়া অন্য একটা দিকও আছে।'

'কী?'

'কেস উঠলে রাহুলরা তাদের পাড়ার কোনও কোনও সাক্ষীকে লোভ টোভ

দেখিয়ে বিগড়ে দেবার চেষ্টা করতে পারে। পারবেই যে, জোর দিয়ে বলছি না। তবে এরকম সম্ভাবনা থাকে। হিউম্যান নেচার একটা অদ্ভুত ব্যাপার।'

জয়ন্তী বলে, 'না না, ওরা ওই ধরনের মানুষ নয়। আমি—'

তাকে থামিয়ে দেয় সুজাতা। 'ইন্দ্রনাথ কাকু, আমি নিজে ওদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আপনাকে সব জানাব।' দীর্ঘকালের সম্পর্কের সুবাদে 'দত্ত ম্যানসন'-এর ছেলেমেয়েরা ইন্দ্রনাথকে কাকু বলে। অঞ্জনের স্ত্রী, তাই তিনি সুজাতারও কাকু।

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'দ্যাটস দা রাইট স্টেপ—'

ইন্দ্রনাথ বোসের সঙ্গে দেখা করার সাতদিনের ভেতর তিনি যে-সব ডকুমেন্টের লিস্ট করে দিয়েছিলেন সেগুলো জোগাড় করে ফেলল জয়ন্তী এবং সুজাতা। আর যে-সাক্ষীদের নাম জয়ন্তী বলেছিল তার কাছ থেকে তাদের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে সুজাতা একাই ওদের সঙ্গে দেখা করল। কেননা জয়ন্তীকে তার শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় নিয়ে যাওয়া ঠিক মনে হয়নি। রাহুলরা ওকে দেখে ফেললে এমন কিছু ঘটতে পারে যা আদৌ প্রীতিকর নয়। তবে লক্ষ্মীকান্তপুরে রাহুলদের কাজের মেয়ে সরস্বতীদের বাড়িতে জয়ন্তীকে সঙ্গে নিয়েই গেছে সুজাতা। অত দূরে রাহুলদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই।

সরাসরি গিয়ে এই যোগাযোগ করায় কাজ হল। সবাই সাক্ষী দিতে রাজি। তারা জানালো অনেক আগেই কেস করা উচিত ছিল। রাহুলদের মতো মূর্তিমান শয়তানদের টিট করা দরকার।

তোড়জোড় শেষ হলে ইন্দ্রনাথ একসঙ্গে অনেকগুলো মামলা রুজু করে দিলেন। মোট চারটি। ডিভোর্স, জয়ন্তীর দুই নাবালক ছেলের কাস্টডি, দিনের পর দিন তার ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালানোর জন্য রাহুলদের উপযুক্ত শাস্তি এবং প্রভূত ক্ষতিপূরণ। দরকার হলে ভবিষ্যতে আরও দু-একটি তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে।

ইন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, কেসগুলো এমনভাবে আটঘাট বেঁধে সাজানো হয়েছে যে রাহুলদের নিস্তার নেই।

এদিকে বাবুনের নতুন কোনও পরিবর্তন হয় নি। তবে একটাই সুখবর তার ভায়োলেন্সটা আর বাড়েনি। ডাক্তার ঘোষ ভরসা দিয়েছেন, এই লক্ষণটা যদি বজায় থাকে, ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

জয়ন্তী শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসায় সুজাতার দৌড়ঝাঁপ খানিকটা কমেছে। ঠাকুরপুকুরের মেন্টাল অ্যাসাইলামে এখন তাকে আর যেতে হচ্ছে না। জয়ন্তীই ছোটাছুটি করছে।

স্বর্ণলতার পেটের যন্ত্রণাটা আগের মতো কখনও কমে, কখনও বাড়ে। তবে বোঝা যাচ্ছে, ক্রমশ আরও নির্জীব হয়ে পড়ছেন।

অন্যদিনের মতো আজও অফিস থেকে ফিরে চা, লুচি টুচি খেয়ে, দোতলায় স্বর্ণলতাদের সঙ্গে দেখা করে, ফের নিজের ঘরে এসে, খাটে আধশোয়া হয়ে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছিল সুজাতা।

সকালের দিকে কাগজ পড়ার সময় থাকে না। তখন অফিস যাবার তাড়া। বাথরুমে যাও, স্নান কর, বাইরে যাবার পোশাক পর, ব্রেকফাস্ট সেরে নাও—এই সব করতে করতে অফিসের গাড়ি এসে যায়।

হেডলাইনগুলোই দেখছিল সুজাতা। ছোট ছোট হরফে খবরের যে সবিস্তার বিবরণ রয়েছে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার মতো এনার্জি তার ছিল না। সেই সকাল থেকে ব্যস্ততা শুরু। সারাদিন অফিস তার জীবনীশক্তির অনেকটাই শুষে ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয়। সারাদিন শরীর জুড়ে শুধুই অপার ক্লান্তি। চোখ বুজে আসছিল তার।

মোবাইল ফোনটা বিছানার একধারে পড়ে আছে। হঠাৎ সেটা বেজে উঠল।

একটু চমকে ওঠে সুজাতা। রজতাভ নিয়ম করে রোজ রাত্তিরে দশটা সোয়া-দশটায় ফোন করে। কিন্তু এ-সময় কে করতে পারে? তার বন্ধুবান্ধব খুব কম। ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্টরা অফিসেই যোগাযোগ করে। অফিস আওয়ার্সের বাইরে পারতপক্ষে নয়। তাদের ম্যানেজার ন'মাসে ছ'মাসে দু-একবার যে করেন না, তা নয়। সেটা খুবই জরুরি কাজে। তিনিই কি? ব্যাঙ্ক থেকে সুজাতা বেরিয়েছে ঘণ্টা দুই আগে। এর ভেতর কী এমন ঘটল যে তাঁকে ফোন করতে হয়েছে?

মোবাইলটা তুলে নিতেই কলার-এর ফোন নাম্বারটা দেখা গেল। ম্যানেজার, রজতাভ এবং তার ক'জন কলিগের নাম্বার সুজাতার মুখস্থ। কিন্তু এটা পুরোপুরি অচেনা। কে হতে পারে?

ফোন কানে ঠেকিয়ে 'হ্যালো' বলতেই শোনা গেল, 'নমস্কার। আমি কি মিসেস সুজাতা দত্ত'র সঙ্গে কথা বলছি?'

গলার স্বর ভারী ধরনের। মনে হয়, লোকটি মাঝবয়সী। বাংলা বলছে ঠিকই, তবে সামান্য দু-একটা শব্দে অবাঙালি টান রয়েছে। সুজাতা জিগ্যেস করল, 'আপনি কে বলছেন?'

'আমার নাম রাজনাথ আগরওয়াল।'

'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

'চেনার কারণ নেই। আগে আমাদের কখনও দেখা হয় নি। তবে আপনাকে আমি চিনি।'

সুজাতা বেশ ধন্দে পড়ে গেল। বলে, 'কীভাবে চেনেন?'

'নানা ভাবে। ভেরিয়াস সোর্স থেকে একটু একটু করে আপনার সম্বন্ধে ইনফরমেশন জোগাড় করেছি। আপনাদের বাড়ির ল্যান্ড লাইন কি আপনার ব্যাঙ্কের ফোন নাম্বার খুব ইজিলি পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার পার্সোনাল মোবাইল নাম্বারটা পেতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আজই সেটা পেয়েছি।' বলতে বলতে একটু থামে রাজনাথ, তারপর ফের শুরু করে, 'ল্যান্ড লাইনে অফিসে কি বাড়িতে ফোন করতে পারতাম কিন্তু কেউ হয়তো তখন আপনার সামনে বসে আছে। আপনার পক্ষে আমার সব কথার জবাব দিতে অসুবিধে হত। তাই করিনি। খবর পেয়েছি, সন্ধেবেলায় অফিস থেকে ফেরার পর আপনি নিজের ঘরে চা'টা খেয়ে একা একা রেস্ট নেন। তাই এই সময়টা বেছে নিয়েছি।'

কে এক রাজনাথ আগরওয়াল জানাচ্ছে সুজাতার নাড়িনক্ষত্র তার হাতের মুঠোয়। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে সে এসব সংগ্রহ করেছে। ভাবতেই সারা শরীরে অদ্ভুত এক শিহরন খেলে যায় সুজাতার। উদ্দেশ্য কী লোকটার? কোনও বদ মতলব? কিন্তু না, ঘাবড়ে গেলে চলবে না। ঝাঁকি মেরে ভয়টাকে সে ঝেড়ে ফেলে। সুজাতা সেকেলে পরদানশিন কুলবধূ নয়। রোজ তাকে বেরুতে হয়, ব্যাঙ্কে বিচিত্র ধরনের গণ্ডা গণ্ডা পুরুষকে সামলানো তার একটা বড় কাজ। দেখাই যাক, অজানা এই লোকটার দৌড় কতদূর।

সুজাতা বলল, 'মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার বুঝি খুব আগ্রহ?

তার কথার মধ্যে শ্লেষ ছিল। সেটা গায়ে মাখল না রাজনাথ। ধীরে ধীরে বলল, 'নো নো ম্যাডাম। সব মেয়ে সম্পর্কে নয়।'

'তা হলে?'

'আপনার মতো ডিস্টিংগুয়িশড মহিলাদের ব্যাপারেই শুধু আমার কিউরিয়সিটি। ইন ফ্যাক্ট তাঁদের সম্বন্ধে ইনফরমেশন কালেক্ট করা আমার সব চাইতে ইমপর্টান্ট কাজ।'

কথা শুনলে মনে হয় লোকটা বিনয়ী, অকপট। এক ধরনের সারল্যও রয়েছে। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র জটিল গোলকধাঁধার মতো। বিনয় টিনয়ের খোলসের আড়ালে কোন অভিসন্ধি লুকনো থাকে, সহজ কি তা বোঝা যায়?

লোকটা ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে টান টান সতর্ক করে রেখেছিল সুজাতা। জিগ্যেস করল, 'আপনি এগ্‌জাক্টলি আমার কাছে কী চান বলুন তো?'

'আপাতত একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'মানে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কেন?'

'সেটা ফোনে বলা যাবে না। ইট উইল টেক আ লং টাইম। অ্যাট লিস্ট টু আওয়ার্স। কোথাও দু'জনকে বসতে হবে।'

মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে সুজাতার। খুব ঠাণ্ডা গলায় সে বলে, 'মিস্টার আগরওয়াল, একটা কথা আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে চাই—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আমার বয়েস টোয়েন্টি নাইন। পিপল সে আই অ্যাম অ্যাট্রাকটিভ। বাট ডোন্ট লুক মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ। বদমাশদের কী করে টিট করতে হয় আমি জানি। আই অ্যাম নট আ উইক উম্যান।'

রাজনাথ হকচকিয়ে যায়। 'এ কী বলছেন ম্যাডাম! আমার বয়েস অ্যারাউন্ড ফিফটি। ইউ মে টেক মি ফর আ জেন্টলম্যান। আপনি আমার মেয়ে না হলেও ছোট বোনের বয়সী। আই অ্যাম আ পারফেক্ট ফ্যামিলি ম্যান। আই লাভ মাই ওয়াইফ অ্যান্ড টু চিলড্রেন। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়েদের আমি মা বোন এবং মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। আই রেসপেক্ট দেম। আই হেট ডিবচারি। আই অ্যাম আ গড-ফিয়ারিং পার্সন। আপনার কথা শুনে ভীষণ দুঃখ পেলাম বহেনজি—'

রাজনাথ আগরওয়াল যদি ঠিক ঠিক বলে থাকে, তাকে ভালোমানুষ বলেই ধরে নিতে হয়। অন্তত মেয়েমানুষ ঘটিত রোগ তার নেই। সুজাতা যতই সাহসী হোক, ভেতরে ভেতরে চাপা একটা উৎকণ্ঠা ছিলই। সেটা অনেকখানি কেটে যায়। সে বলে, 'আপনার নামটাই শুধু জেনেছি। কোথায় থাকেন, কী করেন, এসব কিছুই বলেন নি।'

রাজনাথ বলল, 'আপনার সঙ্গে যখন দেখা হবে, জানাব। এবার বলুন দেখাটা কোথায় হতে পারে। আপনাদের বাড়ি যেতে চাই না। সেখানে ফ্যামিলির অন্য লোকজন থাকবে। হুট করে আমার মতো অজানা একটা লোক হাজির হলে তাদের মনে নানারকম প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। আপনার ব্যাঙ্কেও যাওয়া যায়। তাতে আপনার কাজের অসুবিধে হবে। বাইরে কোথাও কি দেখা হওয়া সম্ভব?'

'বাইরে বলতে?'

'আমি দু'টো ক্লাবের মেম্বার। সানডে ক্লাব আর হরাইজন ক্লাব। আপনি চাইলে এর যে কোনও একটায় দেখা হতে পারে।'

সুজাতা বলল, 'ক্লাবে যাওয়াটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়।'

রাজনাথ বলল, 'দ্যাটস ও. কে। আপনিই তা হলে ঠিক করুন কোথায় দেখা করতে পারি। অবশ্য—'

'কী?'

'আমাদের অফিসে আপনাকে ইনভাইট করতে পারি, যদি আপনার আপত্তি না থাকে—'

রাজনাথের অফিসটা কী ধরনের, সুজাতার জানা নেই। সেটা কোনও বিপজ্জনক ফাঁদ কিনা তাই বা কে জানে। সুজাতা একটু ভেবে বলল, 'আপনি বরং এক কাজ করুন, আমার ব্যাঙ্কে চলে আসুন। সেখানে বেশিক্ষণ সময় দিতে পারব না। ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি মিনিটস। ব্রিফলি আপনার যা জানাবার জানাবেন। যদি আমার মনে হয়, ডিটেলে ব্যাপারটা ডিসকাস করা দরকার, অন্য কোথাও বসে করা যাবে।'

রাজনাথ দারুণ খুশি। বলে, 'থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, মেনি মেনি থ্যাংকস—' তার কণ্ঠস্বর থেকে উচ্ছ্বাস উপচে পড়তে থাকে।

সুজাতা উত্তর দিল না।

রাজনাথ জিগ্যেস করে, 'কাল কখন আপনার অফিসে যাব ম্যাডাম?'

সুজাতা বলল, 'দুপুরে একটা থেকে দেড়টার ভেতর।'

চোদ্দ

সুজাতার মধ্যে প্রবল এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। প্রচণ্ড মনের জোর তার। অসীম ধৈর্য। ধীর, স্থির, বুদ্ধিমতী। কোনও কারণেই সহজে বিচলিত হয় না। সমস্যা যত তীব্রই হোক, সেসব কৌশলে সামলে নেবার ক্ষমতা আছে।

কিন্তু পরদিন অফিসে যাবার পর থেকে মস্তিষ্কে চাপা টেনশন টের পাচ্ছিল সুজাতা। ঘড়ির কাঁটা সময় মাপতে মাপতে যত এগুচ্ছে, ক্রমশ সেটা বেড়েই যাচ্ছিল। কম্পিউটারে কাজ করতে করতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল সে।

রাজনাথ কেন তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে? কাল লোকটার ফোন পাওয়ার পর কোনও রকমে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে, শুয়ে শুয়ে, নানা দিক

থেকে চিন্তা করেছে সুজাতা। কিন্তু আকাশ পাতাল তোলপাড় করেও এমন কোনও কারণ খুঁজে পায় নি, যা যুক্তিসঙ্গত, সন্তোষজনক।

অন্যদিন কাঁটায় কাঁটায় একটায় অফিস ক্যানটিন থেকে সুজাতার লাঞ্চ আসে। দুপুরে বিশেষ কিছু খায় না সে। লাঞ্চে খুব হালকা খাবার তার পছন্দ। এক গেলাস ফ্রুট জুস, দু'পিস চিজ স্যান্ডউইচ, চিকেন স্যুপ, প্রচুর স্যালাড, সেদ্ধ বিনস আর টক দই। তবে বাড়ি ফিরে রাত্তিরে সাত পদ দিয়ে ভরপেট ভাত খায়।

একটা থেকে দেড়টার মধ্যে রাজনাথের দেখা করার কথা। সে আসার আগেই সুজাতা খাওয়াটা চুকিয়ে ফেলতে চায়। সাড়ে বারোটা বাজতে না-বাজতেই সে লাঞ্চ আনিয়ে নিল। কিন্তু টেনশনে পুরোটা খেতেও পারল না। খুঁটে খুঁটে একটু আধটু খেয়ে বেয়ারাকে ডেকে এঁটো প্লেট আর গেলাস টেলাস নিয়ে যেতে বলল।

একটা দশে রিসেপশানিস্ট তরুণীটি জানালো, 'রাজনাথ আগরওয়াল নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। ফোনে নাকি আপনার সঙ্গে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন।'

সুজাতা বলল, 'ওঁকে পাঠিয়ে দাও—'

এক মিনিটের ভেতর তার চেম্বারে যে এসে দাঁড়াল তাকে সুপুরুষই বলা যায়। মারোয়াড়ি ব্যবসাদার বলতে যে মূর্তিটি চোখের সামনে ফুটে ওঠে তার সঙ্গে রাজনাথের অদৌ মিল নেই।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সেটা রাজনাথ আগেই জানিয়েছিল। মেদহীন ঝকঝকে চেহারা। ত্বক এই প্রৌঢ়ত্বেও বেশ মসৃণ। কাঁচাপাকা চুল ব্যাকব্রাশ-করা। টকটকে রং। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়, নিয়মিত জিমে যাবার অভ্যাস আছে। নইলে শরীরে এত ফিটনেস থাকে না। নিখুঁত কামানো মুখ। চোখে সরু ফ্রেমের ফ্যাশনেবল চশমা। পরনে দামি স্যুট। দারুণ স্মার্ট।

প্রয়োজন ছিল না, তবু রাজনাথ নিজের নাম জানিয়ে দিয়ে বলল, 'নমস্কার—'

সুজাতা দুই হাত জোড় করে সামান্য একটু উঁচুতে তুলে বলে, 'বসুন—'

রাজনাথের মুখে আলতো একটু হাসি লেগেই আছে। টেবলের ওধারে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'ধন্যবাদ—'

সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে সুজাতা জানতে চায়, 'টি অর কফি—কী আনতে বলব?'

'ক্ষমা করবেন, এ সময়ে কফি টফি চলে না।' খুব বিনীত ভঙ্গিতে রাজনাথ বলল, 'ম্যাডাম, আমি জানি ব্যাঙ্কে আপনার ওপর অনেক দায়িত্ব। ট্রিমেন্ডাস প্রেসার। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট না করে, আমরা কি কাজের কথায় আসতে পারি?'

সুজাতা লহমায় বুঝে যায় লোকটা পা থেকে চুলের ডগা অব্দি পাক্কা বিজনেম্যান। তার মতো একটি তরুণীর সঙ্গে ফালতু কথা বলে সময় কাটাতে আসেনি। তার উদ্দেশ্য আলাদা, তরুণীর সঙ্গলাভ নয়। এদিক থেকে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল সুজাতা। লোকটা আগে কখনও সামনে না এলেও আড়ালে থেকে দিনের পর দিন তাকে লক্ষ করেছে। একার পক্ষে সবটা তো সম্ভব নয়। হয়তো তার ওপর নজর রাখার জন্য লোকও লাগিয়েছিল রাজনাথ। সুজাতা টেরও পায় নি, কেউ বা কারা তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। তারপর যাবতীয় খবর সংগ্রহ করে রাজনাথ আজ দেখা করতে এসেছে। সুজাতা কোনও উত্তর না দিয়ে রাজনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে। পলকহীন। দেখাই যাক লোকটার কী মতলব।

রাজনাথ বলল, 'ম্যাডাম, আপনি আমার নামটাই শুধু শুনেছেন। বক্তব্যটা শুরু করার আগে একটা ফাউন্ডেশন দরকার।'

সুজাতা বলল, 'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না মিস্টার আগরওয়াল।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি বুদ্ধিমতী। নিশ্চয়ই গেস করতে পেরেছেন, আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই জানি। কিন্তু নাম ছাড়া আমার সম্পর্কে আর কিছুই জানেন না। সেটা জানা দরকার।'

সুজাতা চুপ করে থাকে।

রাজনাথ বলতে লাগল, 'সারনেমটা আগরওয়াল হলেও আমরা বাঙালিই। পাঁচ জেনারেশন কলকাতায় আছি। এই সিটির সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ। আমার মা-বাবা প্রতি শনিবার দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড় মঠে যান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, মা সারদা আর স্বামী বিবেকানন্দর ভক্ত। বেলুড় থেকে দীক্ষাও নিয়েছেন। আমার স্ত্রী আর দুই মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। তারা সুবিনয় রায়ের ছাত্রী। আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলায় এম. এ করে এখন রিসার্চ করছে। তার থিসিসের বিষয় 'ভারত ও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু'। আমি নিজে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ইকনমিকসে অনার্স ছিল। আমার বন্ধুদের বেশির ভাগই বাঙালি। তাঁদের অনেকেই ফেমাস। কারও কারও ভারত জোড়া নাম। কেউ কেউ ইউরোপে আমেরিকায় গিয়ে এস্টাব্লিশড হয়েছে।'

সুজাতা শুনেই যাচ্ছে। লোকটা হঠাৎ সাতকাহন ফেঁদে বাঙালি হিসেবে নিজেকে জাহির করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কেন? তার সেন্টিমেন্টকে উসকে দিতে?

রাজনাথ বলছিল, 'বুঝতেই পারছেন, বেঙ্গলের মাটিতে আমাদের রুট কতটা ঢুকে গেছে।'

সুজাতা বলল, 'আই অ্যাকসেপ্ট ইউ আর আ পারফেক্ট বেঙ্গলি জেন্টলম্যান। কিন্তু ইনট্রোডাকশনটাই শুধু চলছে। কাজের কথা এখনও শুরু হয় নি।'

'এইবার হবে। আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা শুনেছেন। এবার নিজের কথা বলছি। আমি একজন বিজনেসম্যান। আমার রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা, সাউথ ক্যালকাটা আর ই. এম বাইপাসের ধারে অনেকগুলো হাউসিং কমপ্লেক্স আমাদের কোম্পানি তৈরি করেছে। নিউ টাউনে নতুন একটা কমপ্লেক্স করার জন্য ল্যান্ড পেয়ে গেছি। সিঙ্গাপুরের একটা বড় আর্কিটেকচার ফার্মকে দিয়ে বিল্ডিংগুলোর ডিজাইন করা হচ্ছে। আমরা—'

অসহিষ্ণুভাবে সুজাতা বলল, 'মিস্টার আগরওয়াল, আপনাদের কোম্পানির অ্যাক্টিভিটি শোনাবার জন্যেই কি আমাদের আজকের এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

সুজাতা ভদ্রভাবে বুঝিয়ে দিল, কাজের সময় এমন বকর বকর সে আদৌ পছন্দ করছে না।

রাজনাথ সুজাতার অসহিষ্ণুতা গায়ে মাখল না। মুখে দেবশিশুর মতো নিষ্পাপ একটা হাসি ফুটিয়ে খুব শান্ত গলায় বলল, 'এসব না জানালে আমার বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হবে।' একটু চুপ করে থাকার পর পকেট থেকে একটা লম্বা খাম বার করে সুজাতার দিকে বাড়িয়ে বলল, 'ম্যাডাম, কাইন্ডলি এনভেলপটা নিন—'

সুজাতা প্রথমটা অবাক। তারপর গলার স্বর উঁচুতে তুলে রূঢ়ভাবে বলল, 'ওটা আমি নিতে যাব কেন?'

'প্লিজ নিন।'

'ভেতরে কী আছে?'

'খারাপ কিছু নেই। ওনলি আ ফিউ ফোটোগ্রাফস—'

কপালে ভাঁজ পড়ে সুজাতার। চোখমুখ রুক্ষ হয়ে ওঠে। জিগ্যেস করে, 'কিসের ফোটোগ্রাফ?'

রাজনাথ বলল, 'বললাম তো নাথিং ব্যাড। নাথিং অবজেকশনেবল। ঠিক

আছে, আমিই দেখাচ্ছি—' খামের ভেতর থেকে রঙিন ঝকঝকে ক'টা ফোটো বার করে টেবলের ওপর এমনভাবে রাখল যাতে সুজাতা দেখতে পায়।

মুখে যতই অনিচ্ছা জানাক, গোপন একটা কৌতূহল ছিলই। সবসুদ্ধ পাঁচটা ছবি। সেগুলোর দিকে চোখ পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে যায় সুজাতা। ফোটোগুলো তাদের 'দত্ত ম্যানসন'-এর। নানা দিক থেকে তোলা হয়েছে।

রাজনাথের হাসিটা আরও ছড়িয়ে পড়ে। 'চিনতে পারছেন তো ম্যাডাম?'

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে সুজাতার। চাপা গলায় প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'এটা তো আমাদের বাড়ি। 'দত্ত ম্যানসন'-এর ছবি তুলেছেন কেন?'

রাজনাথ বলল, 'এতক্ষণ এত বক বক করে যে গ্রাউন্ড তৈরি করলাম সে তো এই বাড়িটার জন্যেই।'

সচকিত সুজাতা আবছাভাবে কিসের একটা সংকেত যেন পেয়ে যায়। লহমায় শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায় তার। তীক্ষ্ণ গলায় জিগ্যেস করে, 'তার মানে?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে রাজনাথ বলে, 'বাড়িটা সাড়ে সতেরো কাঠা জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে প্রচুর ফাঁকা জায়গা। ওটা তৈরি করিয়ে ছিলেন আপনার দাদাশ্বশুরের বাবা। অ্যাম আই রাইট?'

খানিক আগের বিস্ময়টা হাজার গুণ হয়ে ফিরে আসে। বিমূঢ়ের মতো সুজাতা বলে, 'আপনি এই সব ইনফরমেশন জানলেন কী করে?'

'এটাই আমার কাজ ম্যাডাম।' রাজনাথ বলতে থাকে, 'অ্যান্ড আ পার্ট অফ মাই বিজনেস। কলকাতার যত বড় বড়, সত্তর আশি কি একশ' বছরের পুরনো পুরনো, ভাঙাচোরা বিল্ডিং প্রচুর জায়গা দখল করে কোনও রকমে টিকে আছে, সেগুলোর খবর আমাকে রাখতে হয়। কর্পোরেশন কোন কোন বাড়িতে 'ডিমোলিশন'-এর নোটিশ লাগিয়েছে বা লাগাতে পারে, আমার লোকজন সে সবের খোঁজ নিয়ে আসে। শুধু তাই না, এই বিল্ডিংগুলোর মালিক কারা, কোনও রকম লিটিগেশন আছে কিনা, তাও জানতে হয়।'

সুজাতার মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে যায়। জিগ্যেস করে, 'এর কারণ কী?'

'ম্যাডাম, ওই বাড়িগুলো তৈরি হয় ইন্ডিপেনডেন্সের অনেক আগে। নাইনটিন ফর্টি সেভেনে, অর্থাৎ স্বাধীন হবার সময় কলকাতায় যা পপুলেশন ছিল, এখন সেটা টেন টাইমস কি তার চেয়েও বেশি বেড়ে গেছে। কিন্তু সিটি

কতটুকু বেড়েছে? মুম্বাই দিল্লির মতো শহরের চারপাশে বড় বড় স্যাটেলাইট টাউনশিপ তৈরি হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় সল্ট লেক ছাড়া প্ল্যানড আর কিছুই হয়নি। দু'চারটে করার চেষ্টা চলছে। ফলে সিটির ওপর প্রচণ্ড প্রেসার পড়ছে। সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হল ডোয়েলিং হাউসের। এত মানুষ থাকবে কোথায়? তার জন্যে প্রচুর বাড়ি চাই। সাউথ ক্যালকাটার দিকে যদি যান, দেখবেন, পুরনো বাড়ি ভেঙে ইননিউমারেবল হাই-রাইজ মাথা তুলেছে। কিন্তু—'

রাজনাথের বক্তব্য অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে আসছে। দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রের মতো সে কী ইঙ্গিত দিচ্ছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। তবু সুজাতা বলল, 'কিন্তু কী?'

'নর্থ ক্যালকাটার বেশির ভাগ মানুষজন পুরনো ধ্যানধারণা আঁকড়ে পড়ে আছে। খণ্ডহর টাইপের বাড়িগুলোতে ঘাড় গুঁজে জেনারেশনের পর জেনারেশন কাটিয়ে দেবে। তবু সেগুলো ভেঙে নতুন বিল্ডিং বানিয়ে যে ভালোভাবে থাকবে, তেমন কোনও ইচ্ছাই নেই। বুঝি, অনেকেরই নতুন বাড়ি করার মতো টাকার জোর নেই। কিন্তু তাদের হেল্প করার জন্যে লোক আছে। সাহায্যের হাত তারা বাড়িয়েই রেখেছে।'

'আপনি কি প্রোমোটারদের কথা বলছেন?'

রাজনাথ লোকটা বোধহয় থট-রিডার। সুজাতার মনোভাব লহমায় আঁচ করে নিয়ে বলল, 'প্রোমোটারদের নাম শুনলে অনেকে ভয় পায়। তার কারণ একেবারে যে নেই তা বলছি না। এই রিয়েল এস্টেট বিজনেসে কিছু বাজে লোক ঢুকে গেছে। তারা খুব বেশি হলে টু কি থ্রি পারসেন্ট। তাদের জন্যে বাকি নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট পারসেন্টেরও বদনাম হয়ে যাচ্ছে। তবে আপনাকে আমি অ্যাসিওর করতে পারি, বেশির ভাগ প্রোমোটারই গভর্নমেন্ট, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আর এনভায়রনমেন্টের সমস্ত আইন মেনে কাজ করে। কোনও রকম দুনম্বরী ব্যাপার নেই। এভরিথিং ট্রান্সপারেন্ট। এই আমাদের কথাই ধরুন। এতগুলো কমপ্লেক্স করেছি, অনেকগুলো হাই-রাইজ কমার্শিয়াল টাওয়ার বানিয়েছি। আমাদের কয়েক হাজার ক্লায়েন্ট পুরোপুরি স্যাটিসফায়েড। আমাদের বিজনেসের সিলভার জুবিলি হয়ে গেল। কখনও একটা কেস হয়নি আমাদের এগেনস্টে।'

সুজাতা বলল, 'রিয়েল এস্টেট বিজনেস সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞান লাভ করা গেল। আপনার কথা অনুযায়ী জানতে পারলাম, আপনাদের বিজনেস খুব ক্লিন।

কিন্তু আমার কাছে কেন এসেছেন, সেটা এখনও স্পষ্ট করে বলেন নি। কুড়ি মিনিট সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু আধঘণ্টা পার হতে চলল। আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে—'

রাজনাথ হকচকিয়ে যায়। 'আই অ্যাম স্যরি ম্যাডাম। ফাউন্ডেশনটা তৈরি করতে একটু বেশি সময় লেগে গেল। প্লিজ আর পাঁচটা মিনিট আমাকে দিন—'

সুজাতা বলল, 'ও. কে, জাস্ট ফাইভ মিনিটস। তার বেশি এক সেকেন্ডও নয়।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—'

প্রায় আদেশের সুরে সুজাতা বলল, 'নাউ স্টার্ট—'

রাজনাথ বলল, 'ম্যাডাম, আপনাকে একটা খুব লুক্রেটিভ অফার দিতে এসেছি।'

সুজাতার কপালে বেশ ক'টা ভাঁজ পড়ল। চোখ কুঁচকে গেল। 'লুক্রেটিভ অফার! কিরকম?'

'আপনাদের বাড়িটা সাড়ে সতেরো কাঠা জমি নিয়ে। মূল বিল্ডিংটার এরিয়া বড় জোর তিন সাড়ে-তিন কাঠার বেশি হবে না। বাকিটা ফাঁকাই পড়ে আছে—'

'তা আছে।'

'বলছিলাম, সিটির মাঝখানে অতটা জায়গা আন-ইউটিলাইজড ফেলে রাখার মানে হয় না।'

'আমাদের কিন্তু কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আপনি তো এত খবর রাখেন। নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের এক পয়সাও ট্যাক্স বাকি নেই। বরং এই বছরের লাস্ট কোয়ার্টারের ট্যাক্সও কর্পোরেশনকে মিটিয়ে দিয়েছি।'

রাজনাথ বলল, 'না না, আপনাদের রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি। সামান্য কর্পোরেশনের ট্যাক্স বাকি রাখবেন কেন? আমার প্রস্তাবটা দয়া করে শুনুন—'

সুজাতা বলল, 'বেশ বলুন—'

রাজনাথ সবিস্তার তার প্রস্তাব পেশ করে। সুজাতারা 'দত্ত ম্যানসন' সমস্ত জমিসমেত তার হাতে তুলে দিক। এর জন্য নগদ দু'কোটি টাকা এবং তাদের প্রতিটি ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য একটা করে পনেরো শ' স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট দেবে। বেস্ট কোয়ালিটির মেটিরিয়াল দিয়ে ফ্ল্যাটগুলো তৈরি করা হবে। শুধু তাই নয়, নাম-করা ইন্টেরিয়র ডিজাইনার দিয়ে ফ্ল্যাটগুলো সাজিয়ে দেওয়া হবে। যতদিন নতুন বিল্ডিং তৈরি না হচ্ছে, সুজাতাদের থাকার ব্যবস্থা করে

দেবে রাজনাথরা। দূরে কোথাও না, 'দত্ত ম্যানসন'-এর কাছাকাছি কোনও একটা ফ্ল্যাটে। সেটা কম করে দু'হাজার ফিট। সুজাতাদের যাতে লেশমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধা না হয়, তারা যাতে আরামে থাকতে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখেই এমনটা ভাবা হয়েছে।

সুজাতা বলল, 'মিস্টার আগরওয়াল, আমাদের সঙ্গে আগে কথা না বলেই এত সব ভেবে ফেলেছেন? স্ট্রেঞ্জ!'

সুজাতার কথায় সূক্ষ্ম খোঁচা ছিল। সেটা গায়ে বেঁধে না রাজনাথের। মুখের একটি রেখাও স্থানচ্যুত হয় না। হাসিটি যেমন ছিল তেমনই থাকে। রাজনাথ বলে, 'আপনার মতো হাইলি এডুকেটেড, ইনটেলিজেন্ট লেডিকে একটা প্রস্তাব দেব, আগে না ভেবে প্রস্তুত না হয়ে এলে চলে?'

অনেকক্ষণ নীরবতা।

রাজনাথ অনন্ত আগ্রহে সুজাতাব মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, 'চুপ করে আছেন যে ম্যাডাম? আমার প্রোপোজালটা কি পছন্দ হয়নি?'

সুজাতা প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে বলল, 'কলকাতার যে এলাকায় 'দত্ত ম্যানসন' সেখানে পার কাঠা জমির দাম কত, আমার জানা আছে। অ্যাবাউট বিশ থেকে পঁচিশ লাখ। বাড়িটার টোটাল ল্যান্ডের দাম কত হয়, আপনি নিশ্চয়ই অঙ্ক কষে দেখেছেন। তা ছাড়া, প্যালেজের মতো অত বড় তেতলা বিল্ডিংটা আলাদাভাবে বিক্রি করলে কত পাওয়া যেতে পারে, সেই হিসেবটাও নিশ্চয়ই আপনার মাথায় আছে।'

এবার সামান্য নড়ে চড়ে বসে রাজনাথ। সুজাতা বুদ্ধিমতী, স্মার্ট, বড় চাকরি করে—সবই ঠিক। কিন্তু উত্তর কলকাতার ওই অঞ্চলের জমির দাম সম্বন্ধেও পুরোদস্তুর খবর রাখে, এটা ভাবা যায়নি।

রাজনাথ বলল, 'অলরাইট, নগদ আরও এক কোটি যদি পান, আশা করি, আপনার আপত্তি হবে না।'

সুজাতা বলল, 'আমার আপত্তি করা বা রাজি হওয়া টোটাল মিনিংলেস—'

'মানে?'

'ওই প্রপার্টির মালিক আমি নই। আপনি ভুল ধারণা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন।'

রাজনাথ বলল, 'দলিলে এখনও আপনার নাম না থাকলেও আপনিই সব। 'দত্ত ম্যানসন' সম্পর্কে আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, কেউ তাতে আপত্তি করবে না। ও বাড়ির সবাই তা মাথা পেতে নেবে।'

সুজাতা বলল, 'এগেন ইট'স আ বিগ মিসটেক মিস্টার আগরওয়াল। আপনি আমার সম্বন্ধে খুব সম্ভব প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লাগিয়ে নানা ইনফরমেশন কালেক্ট করেছেন। আমি যে 'দত্ত ম্যানসন'-এর বিধবা পুত্রবধূ ছাড়া আর কিছু নই, সেটা আপনার অজানা থাকার কথা নয়।' একটু থেমে ফের বলে, 'ও বাড়ি সম্পর্কে কোনও ডিসিশন নেবার ক্ষমতা আমার নেই।'

রাজনাথ হেসে হেসে বলল, 'আপনার ব্যাপারে আমার আরও কিছু তথ্য জানা আছে ম্যাডাম—'

ভেতরে ভেতরে বেশ সতর্ক হয়ে গেল সুজাতা। 'কী তথ্য?'

'নিশানাথ দত্ত আর স্বর্ণলতা দত্ত তাঁদের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, নানা ধরনের বন্ড, বড় বড় কোম্পানির শেয়ার—সব কিছু আপনার সঙ্গে জয়েন্টলি করে নিয়েছেন। আপনার ওপর কতটা বিশ্বাস থাকলে এটা করা সম্ভব. সেটা কি আমি বুঝি না? তা ছাড়া, নিশানাথবাবু রোগে বেড-রিডন, স্বর্ণলতাদেবীও কিছুদিন ধরে ভুগছেন। আপনাকে ছাড়া ওঁদের পক্ষে কিচ্ছু করা সম্ভব নয়।'

জবাব না দিয়ে তাকিয়ে থাকে সুজাতা। সে স্তম্ভিত। ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্কের ব্যাপারগুলো খুবই গোপন। তবু কীভাবে রাজনাথ জেনে গেল? লোকটা যে কতটা ধুরন্ধর, তার নেট-ওয়ার্ক যে কতদূর ছড়ানো, ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে। একসময় বলল, 'এত টাকা, এতগুলো ফ্ল্যাট দিতে চাইছেন। তারপর কী পরিমাণ প্রফিট আপনাদের থাকবে মিস্টার আগরওয়াল?'

লজ্জা লজ্জা ভাব করে রাজনাথ বলল, 'কিছু তো থাকবেই। আফটার অল আমরা বিজনেসম্যান। প্রফিট না হলে ব্যবসা করার ঝুঁকি নেব কেন? তবে এই মুহূর্তে প্রফিটের পরিমাণটা জানানো যাচ্ছে না। কর্পোরেশন ক'তলা বাড়ির স্যাংসন দেবে, কতগুলো টাওয়ার কতগুলো ফ্ল্যাট তৈরি করতে পারব, তার ওপর প্রফিটটা ডিপেন্ড করছে।'

রাজনাথের কথা যেন শুনতে পাচ্ছে না সুজাতা। লোকটার চোখ থেকে চোখ সরায় নি সে। বলল, 'প্রফিটটা পাঁচ কোটি হতে পারে?'

'বললাম তো, বিল্ডিংগুলো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কিচ্ছু আন্দাজ করতে পারছি না।'

'মাই গেস, ইট উড বি অ্যারাউন্ড ফিফটিন টু টোয়েন্টি ক্রোর। মে বি মোর—'

এই প্রথম কিছুটা হলেও অস্বস্তি বোধ করল রাজনাথ। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'না না, অত প্রফিট কি থাকে?'

সুজাতা বলল, 'মিস্টার আগরওয়াল, আপনাকে ক্লিয়ারলি একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'কলকাতার অন্য অনেক পুরনো অ্যারিস্টোক্রাট ফ্যামিলির মতো দত্তদের এমন হাল এখনও হয়নি যে জমিবাড়ি বেচে খেতে হবে। নাইনটিনথ সেঞ্চুরির বাবুদের মতো তারা টাকা উড়িয়ে ঝুরিয়ে নষ্ট করে দেয়নি।'

হকচকিয়ে যায় রাজনাথ, 'আমি জানি ম্যাডাম, দত্তদের অনেক টাকা আছে। তবে যার যতই থাক, টাকা এমন এক জিনিস, সবাই তা বাড়াতে চায়।'

'দত্তদের যা আছে তাতেই তারা খুশি। সাত জেনারেশন বসে খেলেও তা ফুরোতে পারবে না। মিস্টার আগরওয়াল, আপনার কথা নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে। আমি আর সময় দিতে পারব না। নমস্কার—'

এরপর আর বসে থাকা যায় না। শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ায় রাজনাথ। বলে, 'ম্যাডাম, আপনারা যদি টাকা আরও কিছুটা বেশি চান, আর দু-একটা এক্সট্রা ফ্ল্যাট দিতে বলেন—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় সুজাতা বলল, 'মিস্টার আগরওয়াল, আমার দিক থেকে যা জানাবার, খুব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি। তবু যদি আপনার বুঝতে অসুবিধে হয়ে থাকে, আবার বলছি, 'দত্ত ম্যানসন' বিক্রি করা হবে না। ইউ মে গো নাউ—'

লোকটার বোধহয় দু'কানকাটা। এই ধরনের বিজনেস যারা করে তারা সহজে হাল ছাড়ে না। তাদের ধৈর্য এন্ডলেস। জোঁকের মতো লেগে থাকার ক্ষমতা তাদের আছে, মানে থাকাটা ভীষণ দরকার। 'আপনি আজ চলে যেতে বলছেন যাচ্ছি। বুঝতে পারছি, কাজের প্রেসারে আছেন। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে না ম্যাডাম—'

'তার মানে?'

'আপনার সঙ্গে খুব শিগগিরই আবার যোগাযোগ করব। আপনি যদি দেখা করতে না চান, ফোন তো আছেই। রোজ একবার, দু'বার, তিনবার, দরকার হলে আরও অনেকবার আপনাকে ফোন করব।'

সুজাতা চমকে ওঠে। ঠান্ডা স্রোতের মতো বিচিত্র এক অনুভূতি—সেটা কি ভয়, নার্ভাসনেস কিংবা অন্য কিছু—তার স্নায়ুমণ্ডলীকে কুঁকড়ে দেয়। পরক্ষণে সামলে নিয়ে নিজেকে শক্ত করে তোলে সে। কঠোর গলায় বলে, 'এভাবে আপনি আমার শান্তি নষ্ট করতে পারেন না।'

যেন কতই না অবাক হয়েছে, এমন একটা ভাব করে, বড় বড় চোখে কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকে রাজনাথ। তারপর বলে, 'কী বলছেন ম্যাডাম, আমি আপনার পিস নষ্ট করব! আপনি একজন রেসপেক্টেবেল লেডি, আমিও কোনও অ্যান্টি-সোশাল নই। আমি শুধু আমার প্রোপোজালটার কথা মনে করিয়ে দেব। তার বেশি একটি এক্সট্রা শব্দও উচ্চারণ করব না। ওয়ার্ড অফ অনার—'

'এক লক্ষ বার ফোন করেও লাভ হবে না মিস্টার আগরওয়াল।'

'দেখাই যাক। জানি বার বার ফোন করলে আপনি রেগে যাবেন, আমাকে গালাগাল করবেন। আমি কিচ্ছু মনে করব না। আসলে কী জানেন ম্যাডাম—'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রাজনাথকে লক্ষ করতে থাকে সুজাতা। উত্তর দেয় না।

রাজনাথ থামেনি। 'আমার মতো রিয়েল এস্টেট নিয়ে যাদের কারবার তাদের বেশির ভাগেরই গায়ে গণ্ডারের চামড়া। একবার যখন তাদের নজর কোনও পুরনো প্রপার্টির ওপর পড়ে, শেষ অব্দি না দেখে ছাড়ে না।'

একটা ঝাঁকি দিয়ে শরীরটা টেনে তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে সুজাতা। এটা যে একটা মাল্টি-ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অফিস, সেটা খেয়াল থাকে না। প্রায় চিৎকার করে ওঠে সে, 'এনাফ মিস্টার আগরওয়াল, এনাফ। কী ভাষায় বললে আমার চেম্বার থেকে বিদায় হবেন? সিকিউরিটির লোকেদের কি ডাকতে হবে?'

'যাচ্ছি ম্যাডাম, যাচ্ছি। কাউকেই ডাকতে হবে না।' রাজনাথ বলল বটে, সুজাতার কথায় লেশমাত্র অপমানিত হয়েছে, এমন লক্ষণ চোখে পড়ল না। কোনও রকম তাড়াহুড়ো নেই, কাচের দরজা খুলে হেলে দুলে সে বেরিয়ে গেল।

করিডর ধরে ডান দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজনাথ। যতক্ষণ লোকটাকে দেখা গেল, দাঁড়িয়েই থাকে সুজাতা। ওধারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার পর বসে পড়ে সে। লোকটার স্পর্ধায় মাথার ভেতরটা তপ্ত হয়ে উঠেছে। কপালের দু'পাশের রগগুলো দপ দপ করছে।

অনেকক্ষণ রগ টিপে বসে থাকার পর ধীরে ধীরে মস্তিষ্ক জুড়িয়ে আসে। তখনই সুজাতার খেয়াল হয়, রাজনাথ তার নাড়িনক্ষত্র জেনে নিয়েছে। ও যেরকম ধুরন্ধর, গোপনে রজতাভর সঙ্গে বিয়ের যে নোটিশ তারা দিয়েছে তার খবর কি আর পায়নি? পেলেও মুখ ফুটে সেটা অবশ্য বলেনি।

বিয়ের ব্যাপারটা জানাজানি হোক, আপাতত সুজাতা তা চায় না। রাজনাথ যদি তার ওপর চাপ দেবার জন্য স্বর্ণলতাদের সঙ্গে দেখা করে বা ফোনে

জানিয়ে দেবার হুমকি দেয়, সেটা হবে ভীষণ অস্বস্তির কারণ। ভাবতেই মাথার ভেতরটা ঘোলাটে হয়ে যায় সুজাতার। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই মনস্থির করে ফেলে সে। যা হবার হবে, একটা বজ্জাত অবাঙালি প্রোমোটার নানা ভাবে ঝামেলার সৃষ্টি করে 'দত্ত ম্যানসন'-এর মতো অত বড় প্রপার্টি কয়েকটা ফ্ল্যাট আর তিন কোটি টাকা দিয়ে হাতিয়ে নেবে, কিছুতেই তা হতে দেবে না সুজাতা। এতে যা হবার হবে।

সন্ধেবেলায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে স্বর্ণলতাকে রাজনাথের খবরটা দিতেই তিনি প্রায় আঁতকে উঠলেন। মাঝখানে ক'দিন ভালো থাকলেও এর মধ্যে শরীর ফের নির্জীব হয়ে পড়েছিল তাঁর। রোগ মনের জোর অনেকটাই হরণ করে নিয়েছে। আগের সেই দাপট আর নেই। ভয়ার্ত সুরে বললেন, 'প্রোমোটাররা জঘন্য ধরনের লোক হয়। শুনি ওদের হাতে প্রচুর খুনি, গুণ্ডা। পুলিশকে টাকা খাইয়ে হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে। নানা পার্টির নেতাদেরও নাকি টাকা খাওয়ায়। রোজ কাগজে দেখি প্রোমোটারদের বন্দুকবাজরা একে খুন করছে, তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। জোর করে লোকের জমি-বাড়ি লিখিয়ে নিচ্ছে। নেতা কি পুলিশ যার কাছেই যাও, কেউ একটা আঙুলও তোমার জন্যে তুলবে না। সবাই বোবা-কালা সেজে থাকবে। আমার ভীষণ ভয় করছে বৌমা—'

স্বর্ণলতা বাড়ি থেকে ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্কে যাওয়া ছাড়া আগে বিশেষ বেরুতেন না। 'দত্ত ম্যানসন'ই তাঁর পৃথিবী। শরীর খারাপ হবার পর এখন বেরুবার কোনও প্রশ্নই নেই। বাড়িতেই বসেই তিনি ভূভারতের খবর রাখেন, এবং সেগুলো শতকরা একশ' ভাগ সঠিক। প্রোমোটারদের সম্পর্কে তিনি যা বললেন তা প্রায় নির্ভুল।

রাজনাথ আগরওয়াল লোকটা কথাবার্তায় বেশ ভদ্র, সাক্ষাৎ বিনয়ের অবতার। বাইরের চেহারাটা তার যেমনই হোক, সুজাতা টের পেয়েছে, প্রোমোটারদের ভেতরে একটা ধূর্ত, হিংস্র চিতা ওত পেতে থাকে। কখন, কীভাবে সেটা ঝাঁপিয়ে পড়বে, কে জানে। লোকটা চাপা হুমকি দিয়ে গেছে, আপাতত বেশ কিছুদিন সে উত্যক্ত করে যাবে।

স্বর্ণলতার কথায় সুজাতার ভাবনাটা এলোমেলো হয়ে গেল। তিনি ফের বললেন, 'বৌমা, শ্বশুরবাড়ির এই সম্পত্তি আমরা প্রাণ গেলেও বিক্রি করব না।'

সুজাতা বলল, 'লোকটাকে আমি এই কথাই বলেছি।'

'কীভাবে আমাদের বাড়ি-জমি রক্ষা হবে, জানি না। তবে সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

স্বর্ণলতা যে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছেন তা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। দত্ত বংশের বিষয় আশয় রক্ষার দায়িত্ব যে তার ওপর এসে পড়বে, সেটা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিল সুজাতা। কিন্তু প্রবল মানি-পাওয়ার, মাসল-পাওয়ার যার রয়েছে, পুলিশ প্রশাসন এবং পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যার কাছে মাথা বিকিয়ে রেখেছে তার সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ চালাবে সেই প্রক্রিয়া জানা নেই। তা হলেও কিছু একটা তাকে করতেই হবে।

আচমকা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা সংকট যখন স্বর্ণলতাকে চরম বিপাকে ফেলে দিয়েছে, তিনি যখন সন্ত্রস্ত, দিশেহারা, তখনই একটু আলোর সংকেত যেন দেখতে পেলেন। বললেন, 'বৌমা, তুমি এক কাজ কর। কালই আমাদের ল'ইয়ার ইন্দ্রনাথ বোসের সঙ্গে দেখা কর। তিনি খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। ওই বজ্জাত প্রোমোটারটাকে ঠেকাবার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দেবেন।'

'আচ্ছা—' আস্তে মাথা নাড়ে সুজাতা।

পনেরো

স্বর্ণলতা বলেছিলেন বটে, কিন্তু পরদিনই ইন্দ্রনাথ বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি সুজাতা। রাজনাথ সত্যিই ফোন করে করে অতিষ্ঠ করে তোলে কিনা, প্রথমে সেটা দেখতে চেয়েছিল।

না, রাজনাথ আগরওয়াল ফাঁকা হুমকি দেয়নি। সকালে দুপুরে বিকেলে রাত্তিরে ফোন করতে লাগল। একটি প্রশ্নবোধক বাক্যের বেশি বাড়তি কোনও শব্দই মুখ থেকে বেরোয় না তার।—'ম্যাডাম, আমার প্রোপোজালটার কথা মনে আছে তো?'

ইন্দ্রনাথ বোসের দু'টো চেম্বার আছে। একটা হাইকোর্ট পাড়ায়। অন্যটা আমহার্স্ট স্ট্রিটে তাঁর নিজের বাড়িতে। দিন সাতেক বাদে অফিস ছুটির পর সুজাতা তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখা করল।

সমস্ত শোনার পর ইন্দ্রনাথ বললেন, 'রাজনাথ আগরওয়াল সম্বন্ধে আমি খুব ভালোই জানি। ভেরি, ভেরি আনস্ক্রুপুলাস পার্সন। একটা ডার্টি স্কাউন্ড্রেল। মুখে সবসময় ভালোমানুষির মাস্ক পরে থাকে, কিন্তু আসলে একটি মূর্তিমান শয়তান। তাই বলে ভয় পেলে চলবে না। প্রথমে এক কাজ কর।'

'বলুন—'

'থানায় লোকটার নামে একটা কমপ্লেন লেখাও।'

'তাতে কি কিছু লাভ হবে? শুনেছি পুলিশ টুলিশের মাথা লোকটার কাছে বিকিয়ে গেছে।'

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার ধারণা মোটামুটি ঠিকই। তবে দু-চারজন অনেস্ট মানুষ কি আর পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নেই? নিশ্চয়ই আছে। সবাই অসৎ, ঘুষখোর, বদ হয়ে যায়নি। যাই হোক, পুলিশ কিছু করুক বা না-করুক, থানায় অন্তত একটা রেকর্ড রাখা দরকার।'

সুজাতা বলল, 'ঠিক আছে, কালই থানায় যাব—'

একটু চুপচাপ।

ইন্দ্রনাথ চোখ আধবোজা করে কিছু ভাবছিলেন। বলে উঠলেন, 'আরে তোমাদের 'দত্ত ম্যানসন' তো টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে, স্বাধীনতার আগে অব্দি ছিল কলকাতার ফেমাস বাড়িগুলোর একটা। আর্কিটেকচারাল মার্ভেল ছাড়াও এখানে সে আমলের বিখ্যাত মানুষেরা এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজি, সুভাষচন্দ্র, সি.আর. দাস—কে নন? এই সব তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ?'

সুজাতা মাথা নাড়ল—শুনেছে।

'তুমি হয়তো আরও শুনেছ, এই ধরনের বিল্ডিংগুলোকে গভর্নমেন্ট 'হেরিটেজ বিল্ডিং' হিসেবে প্রিজার্ভ করতে চায়। 'দত্ত ম্যানসন'কে এর আওতায় খুব সহজেই আনা যায়, আর তা আনতে পারলে এ বাড়ি কেউ কিনতে বা বেচতে পারবে না।'

সুজাতা জানায়, খবরের কাগজে এরকম কিছু কিছু খবর সে পড়েছে। তবে এ সম্বন্ধে তার ধারণা ভাসা ভাসা। গভীর আগ্রহে বলল, 'হেরিটেজ বিল্ডিং-এর জন্যে কী করতে হয়, আমার জানা নেই।'

'সে দিকটা আমি দেখব। কলকাতার মেয়র আমার বন্ধু। আরব্যান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টারকেও ভালো করেই চিনি। এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। কাজটা করতে সময় লাগবে। তোমাকে এঁদের পেছনে লেগে থাকতে হবে।

বাড়িটাকে রাজনাথ আগরওয়ালের মতো হাঙরের হাঁ-মুখ থেকে বাঁচাবার একটা পথ পাওয়া গেছে। সুজাতা টের পেল, তার উৎকণ্ঠার অনেকটাই উধাও। উৎসাহের সুরে বলল, 'ওঁদের সঙ্গে আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখব।'

অগত্যা রজতাভর সঙ্গে বিয়ের যে শেষ নোটিশটা দেওয়া হয়েছিল, সেটা আরও কয়েক মাস পিছিয়ে দিতে হল।

ষোলো

ক্রমশ আরও, আরও জড়িয়ে পড়ছে সুজাতা। অফিসের কাজের চাপ আরও বেড়েছে। একদিকে জয়ন্তীর কেসগুলো ফাইল করা হয়ে গেছে। সেজন্য উকিলের বাড়ি মাঝে মাঝেই জয়ন্তীকে নিয়ে যেতে হয়। ওদিকে বাবুন একটু ভালো হয়ে ওঠার পর ফের তার খ্যাপামি নতুন করে চাগিয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে সেখানে না গেলেও নয়। তার ওপর রয়েছে মেয়র আর নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে ছোটাছুটি। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই সুজাতার।

তবে সবচেয়ে যেটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার, স্বর্ণলতার পেটের সেই যন্ত্রণাটা আবার বেড়ে উঠেছে। কোনওভাবেই সেটা কমানো যাচ্ছে না। এদিকে শরীর ভেঙে যাচ্ছে দ্রুত। চোখ বসে গেছে অনেকটা। গাল ঢুকে গেছে। দৃষ্টি নিষ্প্রভ। চুল ঝরে যাচ্ছে। ত্বক খসখসে হয়ে তার ওপর কালচে ছোপ পড়েছে। খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ। কিছুই হজম হয় না। এতটাই কাহিল হয়ে পড়েছেন যে কথা বলতেও কষ্ট হয়।

বাড়ির ডাক্তার তো আছেনই, অন্য ডাক্তার ডেকেও দেখানো হয়েছে স্বর্ণলতাকে। সবাই নানারকম টেস্ট করতে বলেছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে রাজি করানো যাচ্ছিল না।

যন্ত্রণাটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে, যে শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হল। ব্লাড টেস্ট, এম আর ই, সিটি স্ক্যান, কমপ্লিট হোমোগ্রাম, এল ই টি ইত্যাদি করা পর প্যাংক্রিয়াসে ক্যানসার ধরা পড়ল।

বাড়ির সবাই মিলে ঠিক করা হল, কলকাতায় না, মুম্বাইতে নিয়ে চিকিৎসা করানো হবে স্বর্ণলতাকে।

কে নিয়ে যাবে? সুজাতা ছাড়া কে-ই বা আছে? অফিস ছুটি নিয়ে দু-এক মাস পর পরই স্বর্ণলতাকে নিয়ে মুম্বাইতে দৌড়তে লাগল সে। এদিকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে বার বার নোটিশের তারিখ বদলাতে হচ্ছে।

স্বর্ণলতাকে কিন্তু শেষ অব্দি বাঁচানো গেল না। এক বছর বাদে অপারেশন করানো ছাড়া উপায় ছিল না। তারপর মাত্র একটি মাস তিনি বেঁচে ছিলেন মৃত্যুটা ঘটল মুম্বাইতেই। হাসপাতালে।

প্লেনে মৃতদেহ কলকাতায় নিয়ে আসার সময় সারি সারি মুখচ্ছবি সুজাতার চোখের সামনে ভেসে আসে। বাবুন, জয়ন্তী, সোনা, বিনোদিনী, নিশানাথ। এখনও 'দত্ত ম্যানসন' হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের স্বীকৃতি পায়নি। বাড়িটা যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে। 'দত্ত ম্যানসন' এবং তার এতজন বাসিন্দা—সবার সঙ্গে অপার মায়ায় কতভাবে যে সে জড়িয়ে গেছে, আজকের মতো এমন করে আগে আর কখনও মনে হয়নি। স্বর্ণলতা কি আভাস পেয়েছিলেন, তিনি আর বেশিদিন এই পৃথিবীতে নেই? তাই মৃত্যুর আগে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে, শেয়ারে, লকারে, 'দত্ত ম্যানসন'-এর বিপুল ঐশ্বর্যে তাকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়ে গেছেন?

সুজাতা ক'দিন আগেও ভাবত, 'দত্ত-ম্যানসন' থেকে সে চলে যেতেই পারে। তার প্রস্তুতি করেই রেখেছে রজতাভ।

কিন্তু একটি মৃত্যু সমস্ত ওলটপালট করে দিয়েছে। ক'টি নিরুপায় মানুষকে গভীর খাদের ধারে দাঁড় করিয়ে তার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।

রজতাভকে কলকাতায় ফিরে জানিয়ে দেবে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে আর তারিখ বদলের দরকার নেই। একটাই তো জীবন। বাবুন জয়ন্তী সোনাদের নিয়ে ঠিক কেটে যাবে।

—